দখিণ দুয়ার খোলা



কুমারেশ ঘোষ

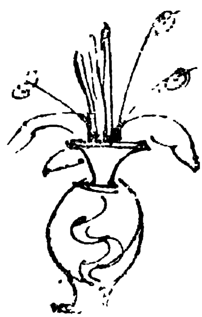
৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ ঃ ৭ই মার্চ ১৯৫৮, তপতী ঘোষ
কর্তৃক গ্রন্থগৃহ, ২৮।১।আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-৫৪
থেকে প্রকাশিত ও চন্দন ঘোষ কর্তৃক ঐ ঠিকানায় মন্মথ-মুদ্রনী
থেকে মুদ্রিত।

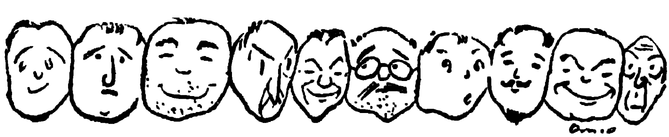
মৃত সঞ্জীবনী সুধা-স্রষ্টা

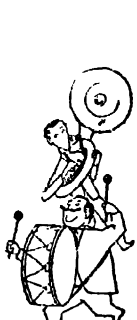
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

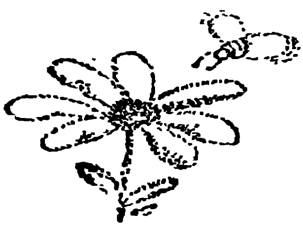
প্রীতিভাজনেষু—



সূচীপত্র



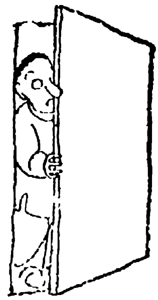




এই লেখকের অন্যান্য রম্যরচনা —

স্বামী পালন পদ্ধতি
ইত্যাদি
ফলন্ত ফুটপথ

দখিণ দুয়ার খোলা





সাধারণ হবার সুবিধে

আমার মতে দূর থেকে সব কিছু দেখাই নিরাপদ। ভীড়ের মধ্যে ভিড়ে না গিয়ে কোন কিছু একটু তফাৎ থেকে দেখা আর্টও নাকি। কারণ মিছিলে যে যোগ দেয়, সে মিছিলের জৌলুসটা দেখতে পায় না। যে পথের পাশে কোন রকে গিয়ে দাঁড়ায় বা দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসে সেই পারে মিছিলের মজা দেখতে।

দেখো, দেখার মধ্যেও অনেক রকম দেখা আছে।

কালো চশমা ব্যবহার করে অনেকে এই সংসারটাকে কালো দেখেন। তাঁরা মধ্যবয়সের ঠেক খাওয়া লোক। অল্প বয়সে তাঁরাই এই সংসারকে রঙীন দেখতেন এবং শেষ বয়সে হয়তো দেখবেন সাদা তাঁদের ক্ষমা-সুন্দর চোখে! তবে সে দেখার ভাগ্য থাকা চাই।

আবার কেউ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাসে দেখেন সব কিছুই। দেখেন এবং দেখান। এঁদের বেশির ভাগই কোন পার্টির নেতা। এঁরা সব কিছুই বাড়িয়ে দেখেন। (নিজেদের দৃষ্টি কম বলে নয়, অন্যের দৃষ্টি কম ভাবেন, তাই।) এবং দলের লোকদেরও তা বাড়িয়ে দেখান। তিলকে তাল করাই এঁদের রীতি।

তবে সবেতেই নাক সেঁটকানো যাঁদের অভ্যাস মানে উন্নাসিক যাঁরা, তাঁরা আবার উপরোক্ত দলের অপোজিট ক্যাম্পের লোক। এঁদের চোখে সব কিছুই ছোট বলেই মনে হয়।

অতএব দেখা যাচ্চে দেখারও প্রকার-ভেদ আছে। কেউ বড় করে দেখেন, কেউ ছোট করে দেখেন। আবার কেউ রঙীন দেখেন, কেউবা দেখেন কালো। তাছাড়া অনেকে লুকিয়ে দেখেন, অনেকে হাঁ করে দেখেন।

আমিও দেখি।

এ সংসারের হালচাল দেখবার জন্যে ঈশ্বর যখন আমার কপালেও দুটি চক্ষুরত্ন সেঁটে দিয়েচেন তখন আমিও অনেক কিছু দেখি বৈকি। তবে অমন ছোট বড় বা রঙীন কালো বা লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখিনে। যা দেখি যেটুকু দেখি,

সোজাসুজিই দেখি। আমার চোখের চশমার কাঁচ দুখানা স্বদেশী এবং বেশ স্বচ্ছ।

কিন্তু এই ভূলোকে কুলোকের তো অভাব নেই। কাজেই অনেকেই ধারণা করে বা সন্দেহ করে—আমার চশমার নাকি কাঁচই নেই, শুধুই ফ্রেম। ওটা নাকি আমার মুখোস। সভ্যসমাজে যেমন জুতো জামা হাতঘড়ি ইত্যাদি না পরলে চলেনা, তেমনি চশমা পরাও নাকি একটি রেওয়াজ। এযুগের মুখোস। নইলে মুখখানা কেমন বোকা-বোকা দেখায়। আর চোখে চমশা আঁটলে মুখখানায় বেশ একটি অধ্যাপকীয় গাম্ভীর্যের পলেস্তারা লাগানো যায়।

আর সেইজন্যই নাকি আমার চশমা পরা।

হতে পারে। কিন্তু ক্ষতি কি?

ফ্রেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে, সংযত হয়ে, যদি আমি খোলা চোখে সব কিছু দেখি এবং কাউকে কিছু দেখাতে পারি—সে তো আমারই বাহাদুরী।

আমি কিন্তু তা বলে চশমা দেখিয়ে চমক লাগাতে চাইনে! আমি সাধারণ হতেই চাই। বিশেষ করে চেহারায়।

চেহারায় সাধারণ হবার অনেক সুবিধে—যদিও অনেকেই সেটা চান না। তা যদি চাইতেন কেউ, তা হলে গালে ঘষবার স্নো-ক্রীম, ঠোঁটে লাগাবার লিপষ্টিক, দাঁত ঝকঝক করবার টুথপেষ্ট, গায়ের রং ফিকে করবার সাবান, মুখখানা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখবার আর্শি এবং চুল কেয়ারি করবার চিরুণী ব্রাশ, হেয়ার লোশন—সব কিছুই বাজে জিনিসের পর্যায়ে পড়তো। নিজেকে এক কাঠি সরেস দেখাবার জন্যে আমাদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা, প্রাণের অদম্য আকাঙ্খা। চেহারায় অসাধারণ হতে অসাধারণ উৎসাহ অনেকেরই।

অবশ্য চেহারায় অসাধারণ হওয়া মানে অদ্ভুত আকার বা কিম্ভূত কিমাকার হওয়া নয়। কিংবা সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগের মানুষদের বর্ণনার মতও নয়। যথা—সুদীর্ঘ আকৃতি, আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষু, খগ বা গড়ুর পক্ষীর মত নাসা, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ ইত্যাদি। কারণ আজকের রাস্তায় যদি দেখা যায়, কোন লোক প্রায় আট ফুট উঁচু, তার হাত দুটো হাঁটু পর্যন্ত লকপক ঝুলচে, চোখ দুটো কান পর্যন্ত টানা, নাক চলচে একহাত এগিয়ে, কপালটা বিদ্যাসাগরী এবং বুকখানা প্রায় গড়ের মাঠ—তা হলে এই চলতি সমাজে তার চেহারায় এ ধরণের অসাধারণত্ব ফুটে ওঠায় কারোর মুগ্ধ দৃষ্টির ছোঁয়া পাওয়া তো দূরের কথা, আমাদের পাঁচজন

লোকের কাছে লোকটা হবে রীতিমতই বিভীষিকা। তাছাড়া তার নিজের পক্ষেও জীবন-যাপন করা হবে বিড়ম্বনা। বাড়ির প্রমাণ-সাইজের দরজায় যাবে তার হরদম কপাল ঠুকে। হাত দুটো টেনে তুলতে দরকার হবে কপি-কলের, চোখে কানে এক হওয়ায় জুলপির চুল পড়বে চোখে, লম্বা নাকে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবার সুবিধে হলেও সে নাক নিয়ে নাকাল হবার সম্ভাবনা পদে পদে, বিদ্যাসাগরী কপালে তেড়ি বাগানো হবে দুরাশা, আর বিশাল বক্ষের কল্যাণে গায়ের একটা পাঞ্জাবির জন্যে লাগবে হয়তো পাক্কা এক থান কাপড়।

বেশি কথা কি, লোকটাকে Rare human specimen হিসেবে চিড়িয়াখানায় রাখার জন্যেও সাধারণ জনগণের দাবি উঠতে পারে।

মেয়েদের ব্যাপারেও বলি, অযথা অসাধারণ হতে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। বিশেষ করে সেই রাম-রাবন বা কুরু-পাণ্ডব যুগের মেয়েদের মত তো নয়ই। এমন কি, কালিদাসের সময়ের মালবিকা-নিপুণিকাদের চেহারায় অসাধারণ হওয়া আজকের দিনে রীতিমত অস্বস্তিকর।

রবীন্দ্রনাথ সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাই সব লক্ষ্য করে সত্য কথাই লিখেছিলেন—

'এখন যারা বর্তমানে
আছেন মর্তলোকে.
ভালোই লাগত তাঁদের ছবি
কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতা মোজা
চলেন বটে সোজা সোজা
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্য দেশীর চালে,
তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্চে সাক্ষ্য
ঠিক যেমনটি দেখা যেত
কালিদাসের কালে॥'

অর্থাৎ দেখা যাচ্চে, কালের সিঁড়ি বেয়ে নামতে-নামতে আধুনিক ধাপে এসে মেয়েরা তাঁদের আঁখির কোণে 'কটাক্ষ'টুকু ছাড়া নিজেদের রূপের আর

যে রূপান্তর ঘটিয়েচেন তা খুব নিন্দনীয় নয়, এমনকি, সেকালীন কালিদাসের চোখেও। (তাছাড়া বুকে কাঁচুলি আঁটা মেয়ে দেখায় অভ্যস্ত কালিদাস নিশ্চয়ই এ যুগে পেটকাটা ব্লাউজ পরা মেয়ে দেখেও চমকে উঠতেন না !)

তা আজকের মেয়েরা যেটুকু নিজেদের রূপের রূপান্তর ঘটিয়েচেন তা হয়তো ভেবে চিন্তেই করেচেন। নইলে সে যুগের মেয়েদের সেই পদ্মের মত আঁখি, তিলফুলের মত নাসা বা তেলাকুচোর মত ঠোঁট নিয়ে ততটা বেকায়দায় না পড়লেও, সেই এলায়িত কেশপাশ, সুকোমল কর-কমল, ললিত বাহুলতা, ক্ষীণ কটিতট, ইত্যাদি এবং কালিদাস ও বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণিত প্রকাশ-অযোগ্য রমণীয় বক্ষ ও নিতম্বের গুরুভার বহন করে ঠাসা বাসে-ট্রামে বাদুড়-ঝোলা হয়ে নিয়মিত দশটা-পাঁচটা অফিস করা আজকের সাধারণীদের পক্ষে হতো যারপরনাই অসম্ভব।

না, না। অমন অসাধারণ কাব্যিক রূপলাবণ্য—আমার তো মনে হয়, কোন আধুনিকাই চান না। বরং বিশ্বকবির সেই সাধারণ মেয়ে হওয়া ঢেরঢের ভাল।

আমি কিন্তু এতক্ষণ প্রাচীনকালের অতি অসাধারণ চেহারার অসুবিধের কথাই বললাম—যা কাব্যে শোনায় ভাল, কিন্তু বাস্তবে রীতিমতই অবাস্তব।

তবে যৎসামান্য অসাধারণ হতে, বিশেষ করে চেহারায় সত্যি কার না ইচ্ছে হয় ! কে না চায় ও আমাকে দেখুক। দেখুক আমি তার মত সাধারণ নই। এই যে ছেলেদের সকাল থেকে ডাম্বেল ভাঁজা বা মেয়েদের নিজস্ব গালে স-বেগে সর-ময়দা ক্রীম রগড়ানো—এ দুটি সৎকার্যের একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য হচ্চে—যতটুকু পারা যায়, চেহারায় অসাধারণ হওয়া।

এই অসাধারণ হবার মোহ কোন আধুনিক রোগ নয়, মানুষের আদিম রোগ। তাইতো কখনো দেখি পুরুষের বাবরি চুল আর একমুখ গোঁফ-দাড়ি। কখনো বা সে সব চেঁচে-ছুলে খোসা ছাড়ানো গোলগাল আলুভাতের মত মুখ। কিন্তু পরবর্তী পুরুষ-সংস্করণে মুখে আবার সেই পুরোন দাড়ি-গোঁফের নবাঙ্কুর। তাছাড়া বাটারফ্লাই গোঁফ, হিটলারী গোঁফ, স্টালিনী গোঁফ, চার্লিচ্যাপলিনী গোঁফ, রাজকাপুরী গোঁফ, এবং আচার্য দাড়ি, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, খাটো জুলপি, ঝোলা জুলপি, সোজা সিঁথি, বাঁকা সিঁথি, ব্যাক-ব্রাশ, কদম-ছাঁট চুল, এলোমেলো চুল—সবই ঐ অসাধারণ হবার রোমঞ্চটুকু উপভোগ করবার খেয়ালেই সৃষ্টি। আর সেই কারণেই নাকে আটকানো রিমলেস চশমা থেকে মোটা লাইব্রেরি ফ্রেমের ক্রমবিকাশ।

এই অসাধারণ হবার ছোঁয়াচে রোগে শুধু পুরুষ নয়, মেয়েরাও ভোগেন এবং একটু বেশিই ভোগেন। তাই তো দেখা যায় তাঁদের ঘাড়ে-ভেঙে-পড়া খোঁপা থেকে এলো-খোঁপা, চুড়ো খোঁপা থেকে নেমে আসা পাটি-খোঁপা, তারপর পাখির বাসা ইত্যাদি। তাছাড়া ববড্-হেয়ার, পুরুষ ছাঁট, বয় ছাঁট, সোজা সিঁথি, বাঁকা সিঁথি—সব নিয়েই চলচে পরীক্ষা আর নিরীক্ষা। তাঁদের চাঁপার-কলি আঙুলের নখ হয়েচে 'নোখর'। তাতে তরুণ-বুকের রক্ত-প্রতীক টকটকে লাল-রং।

আসল কথা, ঐ 'অসাধারণ' ভূতটা আমাদের প্রায়ই প্রত্যেকেরই ঘাড়ে চড়ে আছে। তবে সেই 'ভূতের-নেত্য' লজ্জার মাথা খেয়ে প্রথমেই কেউ দেখাতে পারে, কেউ দেখাতে লজ্জা পায়।

উপরন্তু প্রায় প্রত্যেকেরই মনের কোণে একটু ধারণা উঁকি-ঝুঁকি মারেই যে, তিনি চেহারায় সাধারণ লেবেলের চাইতে বেশ একটু উঁচুতে। এবং সেইজন্যেই তো এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত লোকে হাসিহাসি মুখ করে নানা পোজে টাকায় আটখানা ফটো তুলিয়েচে! (হায়, সে ফটো-যুগ আমাদের ফাটা কপালে টিকলো না। ফরেন কারেন্সির কৃপায় ফিল্ম এখন ফিল্ম-স্টারের মতই নাগালের প্রায় বাইরে!)

যাই, হোক, আমরা যদি একটু স্থিরমস্তিষ্কে ভাবি তবে দেখবো, চেহারায় সাধারণ হবার সুবিধে বহুরকমের। এবং আরো সুস্থির মস্তিষ্কে বা সোজা বাংলায় মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলে দেখা যাবে—চেহারায় 'সাধারণ' হওয়া ব্যাপারটা আইনস্টাইনের Law of Relativity বা আপেক্ষিক নিয়মের চাইতে কোন অংশে কম নয়।

কারণ আমি যাকে সাধারণ বলি, সেটা অন্যদেশে রীতিমত অসাধারণ। অন্যদেশে সাধারণ সৌন্দর্যের পর্যায়ে যা পড়ে, আমাদের দেশে সে রূপ অবাক হয়ে দেখবারই মত। তেমনি আমাদের বাদামী চামড়া, কোন কালো হরিণ চোখ পাশ্চাত্য সহরের পথে পার্কে সাধারণ নয় বলেই বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অন্যদেশের কী কথা, এদেশেই খাটোখোটো বঙ্গ পুঙ্গবের পাশে ইয়া লম্বা চওড়া পাঞ্জাবী চেহারা বিশেষ রকম বস্তু। আবার দার্জিলিঙ্গের হলদে অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ মদ্রদেশীয়দের চোখে বেশ কিছুটা বেমানান। অতএব দেখা যাচ্চে, 'সাধারণ'—স্থান ও পাত্র ভেদে নিঃসন্দেহে 'অসাধারণ'।

যাই হোক, চেহারায় এই 'সাধারণ' ও 'অসাধারণ' কি—তার চুলচেরা তর্ক

না করে স্বদেশে না হোক স্বরাজ্যে (মুস্কিল ! তাই বা বলি কী করে ? কারণ বঙ্গদেশীয় উক্ত দার্জিলিংবাসী পাহাড়ীদের সঙ্গে আমাদেরও চেহারায় বৃহৎ ফারাক !)—যাকগে, স্বরাজ্যে নয় স্ব-সহরেই চেহারায় সাধারণ হবার সুবিধে কি কি, তাই বরং বলি। কারণ এতক্ষণ যা বললাম, তা আমার বক্তব্যের গৌরচন্দ্রিকা হিসেবেই ধরতে পারেন।

চেহারায় সাধারণ হবার সব চাইতে বড় সুবিধে হচ্চে, অন্যের অলক্ষে থেকে সব কিছুই লক্ষ্য করা যায়। আমাকে কেউ লক্ষ্য করচে না, দৃষ্টিবান নিক্ষেপ করচে না আমার দিকে—এর মত আরামের আর কি আছে ! অবশ্য, কোন কালো হরিণ চোখের হৃদয় দোলানো বা ভোলানো কটাক্ষের মধুর ধাক্কার কথা বলচিনে। সে কটাক্ষের ধাক্কা খেতে কে না চায় ! সে ধাক্কা খাবার লোভেই তো ঘন-ঘন তেড়ি বাগানো বা রোজরোজ দাড়ি কামানো, সার্টের কলার ওল্টানো !

সাধারণ চেহারায় আর একটি সুবিধে হাতেকলমে মালুম হয় কোন জামার দোকানে গেলে। আপনার চেহারা যদি সাধারণ হয়, তবে দোকানে গিয়ে রেডিমেড জামা চাইলেই দোকানদার চট্ করে প্রমাণ সাইজের বাণ্ডিলটা বার করে আপনার মনের মত একটা জামা পরিয়ে দেবে আপনার গায়ে। কিন্তু একটু যদি আপনার চেহারা সাধারণ পর্যায়ের এদিক-ওদিক হয়, তখন সেই দোকানদারই আপনার চেহারাটা একটু অপাঙ্গে দেখে নিয়ে আর পাঁচজন খদ্দেরের সামনে কী বলবে জানেন ? বলবে, 'দাও তো হে বেয়াড়া সাইজের জামার বাণ্ডিলটা।'

সত্যিই চেহারায় সাধারণ হলে অনেক সুবিধে।

সাধারণ চেহারায় ছোটবেলায় স্কুলে লাস্ট বেঞ্চে বসবার কথা কে না জানে ! যৌবনে প্রেমের ব্যাপারে চটপট গা ঢাকা দেওয়া যায় যখন-তখন। পৌঢ়ত্বে জামাজুতোয় অযথা বেয়াড়া বাড়তি খরচ নেই। আর বার্ধক্যে বোম্বাই খাটের বদলে সাধারণ দড়ির খাটিয়াই যথেষ্ট !

জনসাধারণের সেবক

জনসাধারণের বা সাধারণ সেবকরা যা-তা সাধারণের লোক নন—রীতিমতই অসাধারণ কিছু। অসাধারণ মেধা, বুদ্ধি বাক-ভঙ্গী এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি ইত্যাদি দামী দামী উপাদানে এইসব সাধারণের সেবক-বৃন্দের সৃষ্টি। মনুষ্যসমাজে এঁরা প্রথম বেঞ্চের মানুষ।

স্যাহিত্য-সেবায় অন্তত দু একটি গল্প-কবিতা মাসিক পত্রস্থ না হলে জাতে ওঠা দায়। রোগের সেবা করতে হলে নার্সিং শেখাও রীতি, নইলে রোগীর প্রাণান্তকর অবস্থা। তেমনি বাপ মায়ের সেবায় চাই আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা—কিন্তু সাধারণের সেবায় এসব কিছুরই বালাই নেই। স্রেফ আস্তিন গুটিয়ে লেগে গেলেই হলো। অবশ্য চাই অসাধারণ ধৈর্য বুদ্ধি আর বাক্‌পটুতা।

সাধারণের অতি-পোক্ত সেবক যাঁরা, তাঁরা স্বজনপ্রিয় না হয়ে জনপ্রিয় হবার দিকেই ঝোঁকটা দেন বেশি। তাই সময়ই থাকে না বাড়িতে তাঁদের অতি সাধারণ বাপ-মায়ের দিকে একটু নজর দেবার। দারুণ শীতে অথর্ব বাপ বা বিধবা মা হয়তো হি-হি করে কাঁপচেন—আর তখন হয়তো সাধারণের দরদী সেবক ক্যামেরার সামনে বাণ্ডিল-বাণ্ডিল কম্বল নিয়ে বিলি করচেন হাসি-হাসি মুখ করে। এবং ঐ কম্বলের আড়ালে যদি কেউ 'সম্বল' কিছু গুছিয়েই নেন, তাতে অন্তত আজকাল হিংসে করবার কিছু নেই। এঁরা পরোপকারের একটু সুযোগের জন্যে মুখিয়ে থাকেন আর বাইরে থেকে এঁদের কার্যকলাপ দেখলেই মনে হয় আ-হা! মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—বা-হা!

এই বাহবাটুকু পেলেই অনেক সময় এই সাধারণের সেবকরা কৃতার্থ। আর খবরের কাগজে যদি নামটা ওঠে, (ছবি উঠলে তো সোনায় সোহাগা!) তবে এঁদের সেবার উৎসাহ উদ্দীপনা উদ্যম উদ্যোগ যেন তুবড়ীর মতই ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কাছাকাছি প্রেস-ফটোগ্রাফার বা রিপোর্টার থাকলে পাড়ার ডাস্টবিনের জঞ্জাল, পচা ডোবার কচুরিপানা কোন কিছুই আর অস্পৃশ্য থাকে না।...তবে

সাধারণের সেবকেরা কিন্তু একথা মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে এই ভুলোকে কু-লোকের অভাব নেই। তারা অনেক কথাই কয়।

যাই হোক, এই সাধারণের সেবা, আমার মতে, আধুনিক বেকার সমস্যার অন্যতম সমাধান। অবশ্য এজন্যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাতে হয় না, কোনো স্কুল কলেজের ডিপ্লোমা বা ডিগ্রিকোর্স পাশ করতে হয় না, অথচ উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-প্রফেসর প্রভৃতির প্রফেসনের চাইতে এই সাধারণী সেবাবৃত্তি কোন অংশে কম তো নয়ই, বরং রীতিমত উচ্চাঙ্গের। উপরন্তু এই কারবারে—থুড়ি, এই সেবাব্রতে রাতারাতি রীতিমত একটি 'ফাণ্ড'-এর ঘট স্থাপনা করা যায় এবং চাঁদার মাধ্যমে যে পরিমাণ চাঁদির আগমন হয়, তাতে নিজের পকেট থেকে কোনরকম ইনভেস্টমেণ্ট বা ক্যাপিটালের দরকার করে না।

না, করে। অনেক সময় চাঁদার খাতা বা কিছু আবেদনপত্র ছাপাতে হয় বৈকি! আর, গালভরা একটা নাম দিয়ে কোন আশ্রম, সংঘ বা সমিতি খাড়া করলে তো কথাই নেই। তা ঐটুকুই তো দীন সেবকদের পরিচয়! উকিল বা মোক্তারের বগলে যেমন নথিপত্র, ডাক্তারের গলায় যেমন ষ্টেথিসকোপ, সাহিত্যিকদের পকেটে যেমন কলম, প্রফেসরের কাঁধে যেমন চাদর, তেমনই এই সাধারণের সেবকবৃন্দের পকেটে উঁকি মারে চাঁদার খাতা এবং অনেকক্ষেত্রে আবেদনপত্র। ঐ দুটিই উক্ত সেবকদের পরিচয়পত্র বা ক্রেডেনসিয়াল।

এই সাধারণের সেবকবৃন্দ আছেন বহুরূপে সম্মুখে তোমার। পাড়ার লক্কা-পায়রা মার্কা ছোকরা বা মস্তান থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবক, সহসম্পাদক, যুগ্মসম্পাদক, শুধু সম্পাদক এবং সভাপতি, সহসভাপতি প্রায় সকলেই নানারূপে এবং নানানরূপে সাধারণের সেবায় উন্মুখ। যেন আগে করে সেবা, মালা পাবে কেবা,—তারি লাগি তাড়াতাড়ি। এঁরা থাকেন বাসে ট্রামে ক্লাবে বৈঠকে শ্মশানে স্টেশনে সভার অনুষ্ঠানে মিছিলে ধর্মঘটে--মানে সর্বঘটে যেন কাঁঠালিকলা!

বাসে-ট্রামে এঁরা যাত্রীদের হয়ে কনডাকটরকে ধমকান। ক্লাবে মিটিং-এ এঁরা হতভাগ্য জনসাধারণের দুঃখে কেঁদে ভাসান। মিছিলে ধর্মঘটে এঁরা সাধারণত জনসাধারণের পুরোভাগেই চলেন—অবশ্য যদি বিপদের কোন গন্ধ নাকে না আসে। এবং জলসা জয়ন্তী পুজো নির্বাচন ইত্যাদির ব্যাপারে

এঁদের চাঁদার খাতা ও বচনভঙ্গীর যে অপূর্ব লীলাখেলা দেখা যায়, তা অনির্বচনীয়।

হ্যাঁ, একটা কথা। এই যে সাধারণের সেবকবৃন্দের গুণ-গরিমার প্রচার—এ শুধু পুরুষ জাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে অন্যায়ই হবে। কারণ এই সব বহুবিধ গুণে গুণবতী সাধারণের সেবিকাও যে আমাদের চোখে পড়েন না, তা নয়। বরং এই স্ত্রীজাতীয়ারা এইরূপ সেবাব্রতে বেশিরকম করিৎকর্মিনী। একে বঙ্কিমচন্দ্র বলেচেনই—সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তাছাড়া এঁরা সাধারণত একটু, এই যাকে বলে একটু মুখর—শুদ্ধ ভাষায় 'মুখরা' হয়ে থাকেন। অতএব পুংসাধারণ যে এঁদের মুখের কাছে স্বভাবতই মূক হয়ে যান—অন্তত হওয়া উচিত, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

তবে একটা খটকা মনকে স্বভাবতই ধাক্কা মারে। জনসাধারণ কেন এই সেবক-সেবিকাদের লক্ষ্য? কেন কোন ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষ এঁদের লক্ষ্য নয়? ···মনের কথাটা আমার এক বন্ধুকে সসংকোচেই বলেছিলাম। বলতেই বন্ধুবর আমার পিঠে একটি বন্ধুজনোচিত মুষ্ট্যাঘাতের মাধ্যমে যা জানালো, তার সারাংশ এই, আমি নাকি একটি আস্ত 'ইডিয়েট' তাই এসবের গভীর অর্থ আমার মস্তিষ্কের আওতার বাইরে।

কারণ, জনসাধারণের সেবায় যেসব অর্থোপার্জন—না, না, অর্থ আদায় হয়, তার নাকি আয়ব্যয়ের হিসেব রাখা নিয়মবিরুদ্ধ, কাউকে কৈফিয়ৎ দেওয়া বোকামি, এবং যদিই বা পরছিদ্রান্বেষীরা এ নিয়ে মৃদু গুঞ্জন তোলে বা নির্লজ্জের মত হৈ চৈ করে, সে সব হেসে উড়িয়ে দেওয়াই নিয়ম এবং দরকার বুঝলে একটু সাময়িক গা-ঢাকা দিলেই নাকি সব ঢাকা পড়ে যায়। পরহিতের পুরোহিতরা তখন পরশুরামের ভাষায়—

'চোক্ষে বান্ধি ফেটা আর কানে দিয়া রুই,
দরজা ভেজাইয়া সুধা গেলে ঢোক দুই!'

হ্যাঁ, বন্ধুবর আরো বললো, এই গণতন্ত্রের যুগে জনগণের সেবাই একমাত্র ধর্ম। সেজন্যে যদি দরকার হয়, সর্বসমক্ষে নিজের নাক-কান মলে গণদেবতা শ্রীগণেশের মত নাক-কানের অবস্থা করলেও লজ্জা পাবার কিসসু নেই। তাছাড়া সাধারণের সেবক হতে হলে নাকি আচরণে ও বিচরণে ঐ দেবতাটির বাহন মূষিকের মতই হওয়া দরকার। সব কিছুই কাটবার দিকে লক্ষ্য এবং সবার অলক্ষ্যে বিচরণ।

চিঠি

তখন বয়েস বেশি নয়। কোন মেয়েকে হাতের কাছে সুবিধেমত পেলে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে তার সঙ্গে বকবকুম করা যেতে পারে এমন প্রেমালু বুদ্ধি তখনো ঘটে আসেনি। বরং গুলি খেলায় রাধা আমাকে ঠকাতে গেলে তাকে ঠেঙিয়েচি, ঘুড়ি ওড়াবার সময় মিনু আমার লাটাইটা ঠিকমত না ধরায় সুতো ছিঁড়ে যেতেই তার মিষ্টি গালে কসিয়েচি চড়। তাছাড়া পাড়ার কোন মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে তার চুল ছিঁড়ে দিয়েচি, বেনুনী টেনে দিয়েচি তার নাক মুখ গাল খিমচে দিয়েচি, অথচ রেগেমেগে তার গাল কামড়ে দেবার কথা কোনদিনই মনে হয়নি।

এমন যখন আমার অ-মেয়েমানুষিক মানসিক অবস্থা তখন একদা আমারই উপর ভার পড়লো সুবোধদা আর বীণাদির প্রেমপত্তর আদান প্রদানের। এই বিশেষ প্রেম-প্রয়োজনীয় পত্রাবলী প্রদানের কাজে প্রয়োগ করবার পক্ষে আর তেমন কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিল না হয়তো। তার কারণ দুবাড়িতেই আমার অবাধ যাতায়াত। তাছাড়া এসব ব্যাপারে আমি যে বুদ্ধিতে খাটো এবং বয়েসে খাটো সেটা সুবোধদা বুঝে নিশ্চিন্ত হয়েছিলো। ঠিকই ভেবেছিলো, আমার দ্বারা বেইমানী হবে না। মানে, আমি যে সুযোগ বুঝে সুবোধদাকে বাদ দিয়ে বীণাদির হৃদয়-তন্ত্রে ঘা দিয়ে তাকে যে অন্য সুরে বাজাবো এমন কোন মারাত্মক ওসমানি সম্ভাবনা ছিল না।

আর আমিও বেশ সরল হৃদয়ে এবং উৎফুল্ল অন্তঃকরণে দুজনের প্রেমপত্তর মানে 'লিখিত বকবকুম' গোপনে দেয়া-নেয়া করতে লেগে গেলাম। এবং তাদের সরকারী ডাকটিকিট বাঁচিয়ে দেওয়ায় সুবোধদা রেস্টুরেণ্টে চিংড়ির কাটলেট খাওয়াতে লাগলেন আর বীণাদি বাড়িতে দিতে লাগলো মুঠো-মুঠো লজেন্স টফি আর কয়েকবার ঘরে তৈরী পিঠে।

তিনপক্ষেরই বেশ চলছিলো, কিন্তু এক অশুভ মুহূর্তে ধরা পড়ে গেলাম মায়ের কাছে। সেদিন বীণাদির কাছে পিঠে খেয়ে তার 'লিখিত বকবকুমটা'

সাঁ করে সুবোধদাকে ডেলিভারী দেবো এমন সময় মনে হলো একবার 'বড় বাইরে' যাবার বিশেষ দরকার। (বোধ হয় ঐ পিঠের জন্যেই)। কাজেই ব্রেকজার্নি করতে হলো। হাফ প্যাণ্টটা বাইরে খুলে রেখে 'বড় বাইরে' থেকে ঘুরে এসে দেখি, সর্বনাশ, সুবোধদার উদ্দেশ্যে বীণাদির 'লিখিত বকবকুম' মায়ের হাতে কীভাবে যেন ডেলিভারিত। হয়তো হাফ-প্যাণ্টটার পকেট থেকে প্রেমপত্রের হাফটা বেরিয়ে ছিলো।

অতঃপর মায়ের পুলিশী-জেরা এবং আমতা আমতা উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে হওয়ায় আমার পিঠের উপর দমাদ্দম দমাদ্দম চলতে লাগলো দমদম দাওয়াই।

সেই থেকে আমার দিব্যজ্ঞান হয়েছে প্রেম মানে পিঠে। পেটে এবং পিঠে খাওয়া।

আজকাল কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকারা চিঠি লেখে কম। অত ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লেখবার সময় কোথায়? তার চাইতে বরং টেলিফোনের ডায়েল ঘুরিয়ে মনের সাধে প্রেম করো! চোখে তারে দেখিনি, তার বাঁশি শুনেছি—এক্ষেত্রে, কথা শুনেছি - একথা আজকের রাধিকারা বলতে পারেন টেলিফোনের কৃপায়। টেলিফোনেই দুপক্ষের মন-প্রাণ ফেনায়িত।

আমি টেলিফোনের নাম দিয়েছি 'ডাকিনী-যন্ত্র'। টেলিফোন চিঠির শত্রু।

এই টেলিফোন না হলে কি মানুষ বাঁচে না? খুব বাঁচে। আগেকার লোক বাঁচতেন কি না? এই টেলিফোন না হলে কি বড় হওয়া যায় না? তাও যায়! উদাহরণ, কালিদাস, সেক্সপীয়র, নিউটন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ আরো নাম বলবার দরকার আছে? টেলিফোন না হলে পেট ভরে না? খুব ভরে। এখনই বরং ভরে না। টেলিফোনে হরিণঘাটার দুধ আনা যায়? সপ্তাহের রেশন আনা যায়? টেলিফোনে যেমন পেট ভরে না, তেমনি মনও ভরে না।

কোথায় সেই মন-ভোলানো মন-ভরানো মধু-ঝরানো প্রেমপত্রের মিষ্টি ডাকের বৃষ্টি? প্রেমপত্রে লেখা সেই 'প্রাণেশ্বর, প্রিয়তম, প্রাণাধিক এবং ওগো আমার মনের রাজা? কিংবা প্রাণেশ্বরী, প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে এবং ছোট্টপাখী লক্ষ্মীসোনা, দুষ্টু আমার' ইত্যাদি? কোথায় সেই নীল কাগজের দশ পাতার চিঠি খামে ভরা আর ভাল করে এঁটে তার পেছনে লেখা ৭৪॥ বা 'যাও পাখি বলো তারে সে যেন ভোলেনা মোরে'? সে সব এখন হারিয়ে গেছে। এখন টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে ৭৫-৩৬৩৯ আর হ্যালো-হ্যালো! এই

টেলিফোনের যন্ত্রণায় এতদিনের বিরহকাব্য-ই গেল মারা। এমনি মারাত্মক এই ডাকিনী-যন্ত্র তথা চিঠির শত্রু।

কিছুদিন আগে টেলিফোন ভবনের সামনে টেলিফোনের যে শ্রাদ্ধ হলো—তাতে আমরা এই শত্রু-দায় থেকে মুক্তি পেলাম কি ? না।

আগে চিঠিতে থাকতো অনেক কিছু প্রলাপ যা অন্য কোথাও অন্য কোনো অবস্থায় লেখা সম্ভব নয়। নববিবাহিতার চিঠি পড়তে তাই তো অনেকে ওৎ পেতে থাকতো। আর নতুন বৌ চেয়ে থাকতো পিয়নের পথের দিক। চিঠি পেলেই ব্লাউজের মধ্যে ভরে, সোজা ছুটে যেতো ছাদের এক কোণে! চিঠি এখানে ছিল কাব্য!

অবশ্য টেলিফোনায়িত সহর ছাড়াও আরো সহর আছে। আজও অনেক স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের বাড়িতে রেখে বিদেশে যায় চাকরি করতে, বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় সেখানে একটা আস্তানা ঠিক না করা পর্যন্ত। শুধু কি স্বামীরাই? · স্বাধীন জেননারাও আজকাল স্বামীকে রেখে বিদেশে যান চাকরি করতে আর সেই সঙ্গে বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে। সে সময়? তখন তো প্রেমপত্তরই একমাত্র অবলম্বন। তাদের কাছে চিঠি তখন চাট্টিখানি নয়।

নইলে এত রেষ্টুরেন্ট আছে, সিনেমা থিয়েটার আছে, ক্লাব আছে, পার্ক আছে—আর নায়িকারাও এখন যখন রীতিমত সূর্যস্পশ্যা—তখন পত্রদূতের দরকার কি? দয়িতা বা দয়িতের মধ্যে চিঠি দেয়া-নেয়াতে দায়িত্বও তো আছে! বাড়িতে ধরা পড়বার ভয়।

তবে চিঠি চিঠিই।

চিঠি মানুষের জীবনে চাট্—চাঁটও বলা যায়।

মদের সঙ্গে যেমন চাট অপরিহার্য—জীবনের পেয়ালায় শুধু একটানা চুমুক দেওয়াটা তেমনি বিরক্তিকর, যদি মাঝে মাঝে চাট্-এর আস্বাদ না পাওয়া যায়। অর্থাৎ তেমন কারোর কাছ থেকে পাওয়া একখানা রসালো চিঠির অনেক দাম এই জীবন মরুভূমিতে।

তবে এই চিঠিই যে আবার চাঁট মারে—তা হয়তো অনেকেই হাতে-কলমে জানেন। মানে, এমন চিঠি মাঝে মাঝে আসে যা চাঁটের চাইতেও মারাত্মক। এমনকি, আচমকা চাঁটাও তার কাছে রীতিমত আরামপ্রদ। ইংরেজ আমলে একরকম চিঠি আসতো, যার সঙ্গে চিনি মাখানো কুইনাইনের বড়ি বা যষ্টি-মধুর তুলনা করা যায় বিনা দ্বিধায়। সে সব চিঠিতে চিঠির তলায় লেখা থাকতো

অতি বিনয়ে শেষ কথাটুকু : your most obedient servant, কিন্তু সেই most obedient servantটি চিঠিতে যে বক্তব্যটি জানাতেন, তাতে অনেকের মাথা ঘুরে তো যেতোই, এমনকি মূর্ছাও গেছে সেই ধরনের অনেক চিঠির অনেক প্রাপকেরা।

পিয়ন চিঠি দিয়ে যায়। অফিসের খামে মোড়া চিঠি দেয়, রঙীন খামে মোড়া চিঠি দেয় আর হুদো-হুদো হাতে লেখা বা ছাপানো পোষ্টকার্ডও বিলি করে। রক্ষে, তারা সেগুলো পড়ে না। পড়ে না তাই দিব্যি দরজার কড়া নেড়ে বা বাইরের লেটারবক্সে সে সব চিঠি ঘুসিয়ে দিয়ে চলে যায়।

যদি পড়তো? দেখতো, সে কারোর চাকরি-খতমের চিঠি দিচ্চে, কিংবা কারোর ছেলের হঠাৎ-মৃত্যুর খবর জানাচ্চে, কিংবা সহুরে ছেলের কেচ্ছা-কাহিনী গোচর করচে—তাহলে সেসব ক্ষেত্রে চিঠি দেবার আগে নির্ঘাত দশবার ভাবতো সে। যদিও চিঠির প্রেরক সরকারের ঘরে পয়সা দিয়ে ডাকটিকিট কিনে চিঠি পাঠিয়েচে— তবু, তবু পিয়ন বলে সে তো মনুষ্যত্ব হারায়নি। তাই চিঠিখানা হয়তো dead letter এ পর্যায়ে ফেলতো। দুঃসংবাদ দিয়ে নিজের কাছে কেন দোষী হতে যাবে সে খামোখা!

তবে আজকাল ডাকঘর ডাকাতের ঘর হয়ে গেছে, আর পিয়নদের মনুষ্যত্ব আছে কিনা সন্দেহ, কাজেই দেখা যাচ্চে, চিঠিরা সব ইচ্ছেমত যাতায়াত করচে বা সরে পড়চে, সঠিক জায়গায় যাচ্চে না। অতএব দুঃসংবাদগুলো হয়তো দূরেই থেকে যাচ্চে।

কিন্তু সুসংবাদগুলো? জীবনটা তো শুধু কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা নয়! মাঝে মাঝে তার বিচিত্র আঙিনায় রঙীন ফুল ফোটে, সগন্ধী ফুল গন্ধ ছড়ায়, পাখি গান গায়, দখিন হওয়া দিব্যি বয়। সেই আবহাওয়া বয়ে আনে পিয়ন বন্ধ খামে চিঠির মধ্যে ভ'রে। কখনো বা পোস্টকার্ডে লেখা কথামালা-র মাধ্যমে! সে চিঠি যেন এক টুকরো চাঁদের হাসি।

এই চিঠি লেখার বাতিক আজকের নয়, বহুযুগের বলা যায়, সেই মান্ধাতার আমল থেকে। এখনকার মত তখন দিস্তে দিস্তে ফুলস্কেপ কাগজ ছিল না বা এয়ার মেলের লেটার প্যাড ছিল না বটে—তবু চিঠি লেখার ধুম ছিল খুবই। কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলা গাছের পাতা যোগাড় করে মনের কথা সাজিয়ে চিঠি লিখতে এমনি ব্যস্ত ছিলেন যে ওদিকে দুষ্মন্ত রাজা যে গাছের আড়ালে উঁকি মারছেন, তা খেয়ালই ছিল না!

মন্দিরের কারুকার্যে দেখি, কোন নায়িকা পাথরের শ্লেটে চিঠি লিখচে পাথরের মোটা পেন্সিল দিয়ে। নাইবা থাকলো কাগজ।

এই চিঠির মারফতেই পৌরাণিক চন্দ্রহাসের কপালে 'বিষ' না জুটে একটি 'য়া' যোগে জুটে গেল পরমাসুন্দরী কন্যা 'বিষয়া' এবং হৃতরাজ্য।

কাজেই চিঠি বাজে বা চাট্টিখানি জিনিস নয়। চিঠি লেখা একটা আর্ট—সে কথা ফরাসীরা দেখিয়েচেন সাহিত্য-জগৎকে। তাঁদের Belle Letters—যাকে বলে পত্রসাহিত্য। আমাদের রবীন্দ্রনাথের পত্রও রীতিমত সাহিত্য। আর সেই থেকে বাংলা দেশে রামা শ্যামা যদু মধু যাঁরই একটু কলমী-নেশা, মানে কলম ধরা অভ্যাস আছে—তিনিই তাঁর পত্রে 'সাহিত্য' করবার চেষ্টা করেন। এ চেষ্টাকে অন্যায় বলিনে, তবে ম্যানিয়া বা ছোঁয়াচে রোগ বলা যেতে পারে।

চিঠি আর আর্শি প্রায় এক জাতের। আর্শিতে যেমন মুখ দেখা যায়, চিঠিতে তেমনি দেখা যায় মন। মানুষের আচার-ব্যবহার স্বভাব-চরিত্র সব কিছু ফুটে বেরোয় তার চিঠির প্রতি লাইনে-লাইনে। এমন কি, তার চেহারাটা কেমন, লম্বা না বেঁটে, মোটা না সরু, তারও হদিস পাওয়া যায় চিঠির হস্তাক্ষরে। এসব হস্তাক্ষর বিশারদদের কথা, আমার নয়।

চিঠি যেমন পাকা দলিল, তেমনি আসল ইতিহাস। কোর্ট-ফি স্ট্যাম্প না থাকলেও হাতে লেখা চিঠি, মানে, তেমন চিঠি হাত করতে পারলে দিনকে রাত করা যায়। আবার সেকালের একখানা তেমন চিঠির খোঁজ পেলে, যেন পাওয়া যায় মাটিচাপা রত্নকে। সেকালের মানুষের আচার-ব্যবহার, বাজার দর, বাজার কর ইত্যাদি বহু কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় একখানা সেকেলে তথ্যপূর্ণ চিঠি থেকে।

কাজেই চিঠি চাট্টিখানি ব্যাপার নয়।

বিয়ে ঃ মধ্যবিত্ত ঃ মধ্যপন্থা

অনেকে বলেন, বিয়েটা নাকি দিল্লীকা লাড্ডুর মতই। কিন্তু আমার মতে মানব জীবনে এই ব্যাপারটি একমাত্র পেঁয়াজের সঙ্গেই তুলনীয়। গোলাপী রংয়ের পাতলা বেনারসী শাড়ির মতই গোলাপী পাতলা খোসায় ঢাকা বস্তুটির পরতে পরতে ক্রমেই রসালো খোসার বা পাঁপড়ির সমাবেশ ঃ যেন সাংসারিক বন্ধনের মহৎ উদাহরণ। একটির পর একটি ছাড়ালে মনে হয় বটে, কই, কিছুই তো পেলাম না। কিন্তু ঐ কিছু না পাওয়ার মধ্যেই অনেক কিছুই পাওয়া যায়। এই বিবাহ-রূপী পেঁয়াজ মানব-জীবনের এক অতি চমকপ্রদ 'পেঁয়াজী'! ধনী বা দরিদ্রের ঘরে কালিয়া বা পান্তাভাতের সঙ্গে চাই-ই। পেঁয়াজকলি দাম্পত্যপ্রেমেরই নধরকান্তি নব-নবতম অবদান!

আসলে ব্যাপারটা কি জানো? জীবনে বি-এ পাশটা না করলেও চলে, কিন্তু বিয়ে না হওয়া স্ত্রী বা পুরুষ রীতিমতই দৃষ্টিকটু। অনেকটা ফুলছাড়া ফুলদানীর মত, খাওয়া কলার ছোবড়া বিশেষ। যেন ময়ূর-ছাড়া কার্তিক, পেঁচাবিহীন মা-লক্ষ্মী, উনুন-ছাড়া রান্নাঘর, স্টেথিসকোপ-ছাড়া ডাক্তার, লাঠি-ছাড়া বৃদ্ধ। মানে, একেবারেই ছন্নছাড়া বা ছন্নছাড়ী। আরো উপমা দিতে পারি। যথা ঃ মাইক বিনা বক্তা, ঘুঙুর বিনা নর্তকী, 'বোয়' বিহীন রেষ্টুরেন্ট, বাড়ির খালি গ্যারেজ, পাখির খালি খাঁচা ইত্যাদি। এক কথায় ঘরণী ছাড়া ঘর আর কর্তা ছাড়া বাড়ি স্রেফ আস্তাবল। রাম বলো!

তা ছাড়া স্ত্রী থাকলে কত সুবিধে! ইনকামট্যাক্সে কিছু যাহোক রেহাই আছে, লেডিজ সীটে বসবার সুযোগ ঘটে, টিকিট কাটতে কিউ দিতে হয় না, ছেঁড়া সেলাইয়ের ভাবনা থাকে না এবং সব চাইতে বড় কথা, 'পাক-প্রণালী'

পড়া না থাকলেও প্রায়ই গুড-ব্যাড বা ভালমন্দ কপালে জোটে। তবে আরো যা জোটে, তার ভয়ে বিয়ে যারা করে না, তারা ভীরু। তারা হুল না খেয়েই মধু খেতে চায়। তারা ফাঁকিবাজ। জল না ছুঁয়েই মাছ ধরবার সাধ। তাদের হাতে 'নাই ভুবনের ভার'। কেন? যে আকাশে চাঁদ ওঠে, সে অকাশেই ঝড় ওঠে না? এই সব ভেবেই, বুঝলে, বিয়ে করাকে আমি বিশুদ্ধ পবিত্র কর্ম ও বীরোচিত কার্য বলেই মনে করি।

আর বিশেষ করে কোনো সর্বগুণসমন্বিতা, পূর্ণচন্দ্রনিন্দিতা, গোলাপ-গুচ্ছলাঞ্ছিতা নারী—আরো ভাল ভাষায়—মহিলা যিনি নিয়মিত অফিসে যাতায়াত করেন এবং মাসের পয়লা তারিখে ভ্যানিটি ব্যাগ ভরে একগোছা কড়কড়ে নোট আনেন ঘরে, অথচ দুরারোগ্য অম্বলের রোগ থাকায় খাওয়ার তেমন খরচ নেই—তেমনি কোনো মহিলা বিয়ের ব্যাপারে অতি সুপাত্রী সন্দেহ নেই।

সত্যিই যারা ভীরু, তারাই ভয় পায় বিয়ে করতে। রবিঠাকুর তাদের উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন, ওরে ভীরু তোমার উপর নাই ভুবনের ভার!

এখন একটু তত্বকথা বলি। অনেক ব্যাপারেই মধ্যপন্থা ভাল নয় স্বীকার করি, কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে মধ্যপন্থাতেই সুখ এবং স্বস্তি। এখানে লেফটিসট্ বা রাইটিস্ট হতে হলেই গেছো। অর্থাৎ উত্তমপন্থা হচ্চে মধ্যম-পন্থায় প্রেয়সীর কথামত হ্যাঁ-ও করতে হবে, না-ও করতে হবে।

অর্থাৎ ঘরে প্রেয়সীর সঙ্গে তাল রেখে চলবার জন্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা যেমন দরকার, তেমনি 'ঘর করবো, কি করবো না'-এই মধ্যপন্থার দোটানায় পড়া বোকামী। সে কারণেই সেকালে শ্রীরাধিকার গার্হস্থ শান্তিতেও ঘটেছিল রীতিমত ব্যাঘাত। শেষে তার অবস্থা হয়েছিল, শ্যাম রাখি না কুল রাখি। জানি তো শ্রীরাধিকার সেই করুণ ক্রন্দন—

'শুনলো প্রাণের সই, মনের কথা তোরে কই,
গিয়েছিলাম যমুনার জলে,
নন্দের দুলাল চাঁদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ
দেখি, ব্যাধ-ছলে কদম্বেরই তলে॥'

আবার ঘরেও বিবাদ—

'শঙ্খবণিকের করাত যেন দুদিগে কাটিয়া যায়,
তেমনি আমার গুরুজনা কাটে, দ্বিজ চণ্ডিদাস কয়।'

শেষে তাঁর অবস্থা হলো, 'হায় কি করি ?' আর তাই পদে পদে তাঁর ভুল হতে লাগলো—

'পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার,
গলাতে কিঙ্কনী পরে, কটিতটে হার ॥
চরণে কাজর পরে, নয়নে আলতা,
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা ॥

আরো দেখেচি আমরা পাণিগ্রহণের পর মধ্যপন্থার টানা-হ্যাঁচড়ায় আশ্রম-কন্যা শকুন্তলার দুরবস্থা। রাজা দুষ্মন্ত তো আশ্রমে এসে প্রেম করে বিয়ে করে শকুন্তলাকে একটা আংটি পরিয়ে চলে গেলেন এবং দেশে ফিরে আরো পাঁচটা রূপসীর রূপসুধা পান করে আশ্রমের কথা স্রেফ ভুলেও মেরে দিলেন। কিন্তু বেচারী প্রথম প্রেমের পরশ-পাওয়া শকুন্তলা বিরহে হয়ে উঠলেন প্রায়-পাগলিনী। স্বামী-দর্শনের জন্যে তার মন করতে লাগলো আকুলি-বিকুলি। অথচ এদিকে আশ্রম-পিতা বৃদ্ধ কণ্বমুনি, সখীবৃন্দ আর অতদিনের আশ্রম ছেড়ে যেতেও মন চাইচে না। তাই সজল চোখে প্রিয়ংবদাকে বললেন, 'সখি আর্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন উঠিতেছে না।'

অতএব দেখা যাচ্চে, এই 'মধ্যম' অবস্থাটা অনেক সময় মানসিক 'উত্তম-মধ্যম'-এর মতই সঙ্গীন অবস্থাতে এসে দাঁড়ায়। তাই হয়তো আজকাল সর্টকাট' মেডইজির যুগে অনেক মেয়েই শ্বশুরবাড়ি – থুড়ি, স্বামীর ঘরে যাবার সময় আর মাঝপথে থমকে থেমে দাঁড়ায় না। একেবারে বাপেরবাড়ি থেকে বেরিয়ে মনের মানুষটিকে টেনে নিয়ে রেজেস্ট্রী অফিস ঘুরে একেবারে নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠে। সত্যিই তো, শ্রীরাধিকার মত আজকের রাধিকাদের অতদিন ধরে প্রেম আর বিরহের দোলায় দোল খাবারই বা সময় কোথায় ?

তবে দেখা গেচে, পাণি-পীড়নের আগে পূর্বরাগের আশায় অনেক একালীন তরুণরা কিন্তু মধ্যপন্থাই অবলম্বন করে থাকে। তাই বোধ হয় তারা পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে একজোট হয়ে। তাতে কোন মেয়ে আকৃষ্ট হয় কিনা জানিনে, তবে অনেক মোটরকার আটকে থাকে দেখেচি।

রাজনীতিতেও এই মধ্যপন্থা মাঝে-মাঝে ব্যাঘাত ঘটায়। ভারত আজ মধ্যপন্থা নিয়েচে বলেই তো কত না বেসুরো আওয়াজ, কত না বিরূপ ব্যাখ্যা।

তাছাড়া শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও এই মাধ্যমিক বা ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাস বা পরীক্ষা কবে উঠিয়ে দেওয়া হয়েচে। ট্রেনেও তাই। ইণ্টার ক্লাস বা মধ্যম শ্রেণী ঘসে ঘসে মুছে দেওয়া হলো কামরার গা থেকে। মধ্যবিত্তরা তাই তো এখন ফাস্টো কেলাস আর থারডো কেলাসের মাঝে পড়ে স্যাণ্ডুইচড্ হবার উপক্রম। তাদের জীবনে এখন ইণ্টার বলতে রয়েচে শুধু চাকরীর জন্যে ইণ্টারভিউ! তাই, হয়তো এখন মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক প্রার্থনা হচ্চে, হে ঈশ্বর, হয় আমার মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দাও, আর নয়তো মাথায় ঝাঁকা বইবার সাহস দাও। অর্থাৎ এস্পার ওস্পার যা হয় একটা করো। এমন করে আর মাঝপথে ত্রিশংকু করে ঝুলিয়ে রেখো না।

তবে ঐ যে বললাম, পাণিগ্রহণের ব্যাপারে কিন্তু মধ্যপন্হাই উত্তম পন্হা। শুধু গ্রহণের সময় নয়, আগে কিংবা পরেও। দাসখৎ লেখা বা মেজাজ দেখানোর চাইতে এসব ক্ষেত্রে মাঝামাঝি চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে নিজের মতটা থাকলো না বলে ব্যাপারটা হয়তো সুখের হয় না, তবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা যায় নিঃসন্দেহে। এবং এইভাবে মধ্যপন্হী না হয়ে একটু দক্ষিণ বা বাঁয়ে গেলেই –দাম্পত্য প্রেমের মোটরগাড়িখানার টায়ার ফটাস্ করে পাংচার্ড হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাই তো সেকালীন পণ্ডিতদের সর্বকালীন বাণী হচ্চে ঃ অর্ধং ত্যাজতি পণ্ডিতঃ।

একালের বিশ্বকবিও তো এই রকম কথাই কৌশলে বলে গেচেন। বলেচেন, 'ঘরেও নহে পারেও নহে, যেমন আছে মাঝখানে, সে-ই বসেচে ঘাটের কিনারায়।' কবিগুরুর এই লাইনটির গূঢ় অর্থ হচ্চে এই যে—পাণিগ্রহণের পরে অনেকেই এমন পাল্লায় পড়ে যে, দশটা-পাঁচটা অফিস করবার পর তাকে ঘরেই বন্দী থাকতে হয় –ক্লাব আড্ডা সব শিকেয় ওঠে, কিংবা নবতমা প্রিয়ার চাঁদমুখখানি দেখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিজেই ঘরে বন্দী হয়।···আবার এও দেখা গেচে, প্রিয়ার মুখের 'মধুবর্ষণে'র ভয়ে লোকটাকে শুধু ঘরের চৌকাঠ নয়, পগার পার হয়ে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে তেমন ঘরেও নয়, পারেও নয়, মাঝামাঝি থাকবার সুযোগ পায় –সে-ই এসে বসতে পারে প্রেম-দরিয়ায় ঘাটের কিনারায়।

আচ্ছা ধরো, তুমি খুব তৃষ্ণার্ত। ছাতি প্রায় ফাটে-ফাটে। সে সময় কেউ তোমার কষ্ট দেখে তোমার সামনে ধরালো এক গেলাস ঘন ঘোল। কিংবা তাড়াতাড়ি কল খুলে এক গেলাস জল। খাবে হয়তো যেটাই পাবে, তবে

তৃপ্তি পাবে না। কিন্তু যদি কেউ ভিজে ন্যাকড়া জড়ানো কুঁজো থেকে গোলাপ জল দেওয়া এক গেলাস ঠাণ্ডা জল তোমার সামনে এনে ধরে? তুমি তখনই ঢকঢক করে খেয়ে পাবে পরম পরিতৃপ্তি।

এই 'পানি' বা জল গ্রহণের মতো পাণিগ্রহণের ব্যাপারেও তাই। যদি কেউ নিজের অবস্থা—মানে, আচার ব্যবহার, সাজ-সমাজ ইত্যাদি বিবেচনা না করে লুসি-জুসি অথবা পাঁচি-ঘেঁচির শরণাপন্ন হয়ে বলে—দেহি পদপল্লবমুদারম—তাতে তার অপদস্থ হবার সম্ভাবনাই বেশি · সুখ বা স্বস্তি পাওয়া দূরের কথা।

তার চাইতে একটি শ্যামলী মেয়ে, নরম সরম মুখে মিষ্টি হাসি, টেলিগ্রাম এলে ভয়ে কেঁদে ফেলে না, মাঝে মাঝে সিনেমায় যেতে চায়, কখনো নিয়ে না গেলে ঠোঁট ফোলায়—তবে আদর করলে গলে যায়, রেডিয়োয় মহিলা মহলে পাকপ্রণালী শুনে ছুটির দিনে সেসব রেঁধে খাওয়াবার চেষ্টা করে—তাছাড়া বিছানা পাতে, ঘর ঝাঁট দেয়, ঝি না এলে বাসনও মাজে,—আবার, স্বামীর বন্ধুদের সামনে এলে লজ্জায় লজ্জাবতী লতা হয়ে যায় না—এবং বড় কথা, টাকা পয়সার জন্যে ঘ্যানর ঘ্যানর করে না, অথচ সুবিধে পেলেই সার্ট পাঞ্জাবীর পকেট মারে—আর ধরা পড়লে বলে, তোমারই ভালোর জন্যে মশাই—এমনি ধরণের একটি মধ্যমা পত্নী—পাণিগ্রহণের সময়ে হাতের কাছে পাওয়া খুব সোজা নয়, এবং ভাগ্যক্রমে পেলে বিয়ের মন্ত্রে প্রাণ খুলে বলা যায়—ওঁ স্বস্তি!

আমার মতে ঘরের এক একটা গৃহিণী দশ-বিশটা রাজনীতিক, অর্থনীতিক এবং সমাজসেবীর নির্যাস দিয়ে তৈরি। তাই তো মেয়ের বিয়ের সময় বলতে শুনি ঐ মধ্যপন্থার কথা: ছেলেটি আমাদের পালটি ঘরের হবে, ভালো একটা চাকরি করে, স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান হওয়া চাই, আর বাড়িঘর থাকে তো ভালোই—এর চাইতে বেশি কিছু আশা করিনে বাপু।

আর ছেলের বিয়ের সময়েও ঐ একই কথা: মেয়েটি ভালো বংশের হওয়া চাই, আমাদের মতোই মধ্যবিত্ত ঘরের, মাজাঘষা রং হলেই চলবে। দু'একটা পাশ থাকলে আজকের দিনে মন্দ নয়, আর ঘরকন্নার কাজকর্ম করতে পারে—ব্যাস তা হলেই হলো। আমার বাপু মেমসাহেবের দরকার নেই।

অর্থাৎ এইসব দূরদৃষ্টিসম্পন্নাদের মতে, স্বস্তি এই মধ্যপন্থাতেই অস্তি।

কী খাই ? কী খাই ?

সংসারে বেশির ভাগ অশান্তি দেখা যায় খাওয়া নিয়ে। মনের মত খাওয়া না জুটলেই মেজাজ যায় বিগড়ে। তাছাড়া এই যে আমাদের রোজ ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি—সে তো শুধু ঐ খাওয়ার জন্যেই। ঘুম থেকে উঠেই বাজারে ছোটো, তারপর নাকে মুখে কিছু গুঁজে অফিসে ছোটো। তারপর ফেরবার পথে উপরি-উপায়ের জন্যে ছেলে পড়াতে বা দোকানের খাতা লিখতে ছোটো—সবই তো ঐ খাওয়ার জন্যে, পোড়া পেটের জন্যে। আর গিন্নীও তো দেখি সকাল-সন্ধ্যায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন রান্নাঘরে—সেও ঐ একই কারণে।

তবু দেখি সংসারে অশান্তি লেগেই আছে—ঐ খাওয়ার জন্যেই। এটা খাবো না, ওটা খাবো না, এটা বাজে, ওটা বাজে, এটা নুনে পোড়া, ওটায় নুন হয়নি, এ মাছটা পচা, মাংসটা বুড়ো পাঁঠার—ইত্যাদি !

অর্থাৎ সব ঐ খাওয়া নিয়ে।

সকলেরই মনে এবং মুখে ঃ কী খাই ? কী খাই ?

একটা প্রবাদ আছে ঃ অল্প খাবে তো অনেক খাও, আর অনেক খাবে তো অল্প খাও।

হয়তো ঐ প্রবাদবাক্য স্মরণ করেই আমাদের সরকারী কর্মকর্তারা রেশন-ব্যবস্থা চালু করেছেন। অর্থাৎ অল্প করে খেলে বেশিদিন খাওয়া যাবে, আর অনেক কিছুই খাওয়া যাবে ?

কিন্তু অনেক কিছু কী খাওয়া যাবে ?

পুরনো দিনে যা অল্পবিস্তর খেয়ে এসেচি, তা তো একে একে গল্প হয়ে দাঁড়িয়েচে। অতএব প্রতিদিনের পরিকল্পনা হচ্চে বিকল্প-খাদ্য কিছু খুঁজে বার করা যায় কিনা—যাতে পাওয়া যাবে ভোজের আনন্দ এবং মনের শান্তি।

হ্যাঁ, মনের শান্তি এখন আর টাকা-পয়সায় নয়, ফাঁকা পেট ভরাতে

পারলেই। এবং সেজন্যে চলিত খাদ্য না জোটে, অপ্রচলিত বা বিকল্প খাদ্য-ব্যবস্থা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আরে ভাই, কালে-কালে সবই যখন বদলাচ্চে, তখন সেকেলে খাওয়ার ধরণ-ধারণ আর অভ্যেসই বা বদলাবে না কেন? বদলানো উচিত। যদি ছেলেদের সার্টের ঝুল বা কলারের কায়দা বদলাতে পারে, মেয়েদের ব্লাউজের হাতা আর গলার কাট বদলাতে পারে, ছেলেদের টেড়ি আর মেয়েদের খোঁপার ফ্যাশন বদলাতে পারে, আমাদের চোখের পাওয়ার বদলাতে পারে, বছর বছর স্কুলের বই বদলাতে পারে—তবে আমাদের খাদ্য যদি দিনকে দিন বদলায় তাহলে মুখখানায় বাদলা ভাব আনবার এমন কি আছে? বরং হাসি-হাসি মুখ করে ফাঁসীর খাওয়া না জুটুক, এমন কিছু আমরা পেলেই খুশি, যা পেট ভরাবে এবং মন ভরাবে।

তাছাড়া এর আগেও কি আমাদের খাদ্য-ব্যবস্থা বদলায় নি? বদলেচে।

পুরনো দিনে আমাদের ঘরে যা রান্না হতো, তার একটু নমুনা চেখে দেখলেই বোঝা যাবে যে পরে সে সব খাদ্য ক্রমে অচল হয়ে গেচে।

> 'কলার থোড় রান্ধিতে বাটিয়া দিল রাই।..
> সরিষা বাটা দিয়া রান্ধে পাণি কচুর বৈ॥...
> শুক্তাপাতা দিয়া রান্ধে কলাইয়ের ডাল।
> পাকা কলা লেবু রসে রান্ধিল অম্বল॥'

মিষ্টান্ন বলিতে—

> 'ঘৃত পোয়া চন্দ্রকাইট আর দুগ্ধপুলী।
> আইল বড়া ভাজিলেক ঘৃতেতে মিশালী॥'

আর মাছ মাংসের ব্যাপারে

> 'বড় বড় ইঁচা মৎস্য করিল তলিত
> রিঠা পুঁটা ভাজিলেক তৈলের সহিত!
> পাবতা মৎস্য দিয়া রান্ধে নালিতার ঝোল।
> পুরান কুমড়া দিয়া রোহিতের কোল।...
> ধনিয়া সলুপা বাটি দারচিনি যত।
> মৃগমাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক কত॥'

কিন্তু এসব খাদ্য ছেড়ে দিয়ে লোকে ধরলো পোলাও কালিয়া কোর্মা কোপ্তা চপ কাটলেট অমলেট কেক পুডিং—আরো কত কি!

অর্থাৎ খাদ্য-পরিকল্পনায় ক্রমশই বিকল্পখাদ্য দেখা যেতে লাগলো—দায়ে পড়ে নয়, মুখ বদলাবার জন্যে। মেঝেয় থালায় সাজানো খাদ্যবস্তু রূপ বদলে প্রমোশন পেলো ফুল সাজানো টেবিলে কাপ ডিশের মধ্যে।

এমনই হয় এবং হচ্চেও।

এই তো এতদিন জানতাম লাল টুকটুকে টমেটোয় নাকি প্রচুর খাদ্যপ্রাণ—অর্থাৎ ভাইটামিন। এখন শুনচি ঐ বিলিতী বেগুনের নাকি গুণই নেই। (তবে বিলিতী সাহেবরা চলে যাবার পর এই আবিষ্কারটি হওয়ায় আমি কিন্তু এ বিষয়ে খুব নিঃসন্দেহ নই।)

আবার যে পেয়ারা খেয়ে ছোটবেলায় গার্জেনদের তর্জন-গর্জন শুনতে হয়েচে পেট কামড়াবে বলে, এখন শুনচি ঐ পেয়ারা ফলটির সঙ্গে স্বাস্থ্যের নাকি রীতিমত পেয়ার! তিন তিনটে আপেলের সমান নাকি একটিমাত্র পেয়ারা। (এও কি দেশি ফল বলে পক্ষপাতিত্ব।)

আর কিছুদিন আগে এক মার্কিনী বিজ্ঞানের পত্রিকায় পড়েছিলাম, এখন আর 'An apple a day' নয়-- 'An onion a day, keeps doctor away'. অর্থাৎ পেঁয়াজের পেঁয়াজিও এখন থেকে সহ্য করতে হবে। আর আপেল? হায় আপেল—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে হচ্চে, তোমার দিন গিয়াছে।

তাছাড়া এতদিন পালংশাকে ভাইটামিন আছে জেনে চোখ বুজে মহা আরামে খুব চিবিয়েচি, চিবোচ্চিও। এখন শুনচি, নটেশাকও কম নন। তিনিও এখন নাটের গুরু। তেমনি রাঙা আলুও আর লজ্জায় লাল হয়ে নেই, তিনিও ঠেলে উঠেচেন—আমিও কমটা কিসে?

অতএব দেখা যাচ্চে, খাদ্য এবং খাদ্যাভ্যাস ক্রমেই বদলে যাচ্চে এবং তাতে বাংলা কাব্যও ক্রমে সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। ঈশ্বর গুপ্ত মশায় পাঁঠা তপসে মাছ ইত্যাদি নিয়ে কাব্য করেছিলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ কবিরাও তেমনি নতুন নতুন খাদ্যবস্তুকে বিষয়বস্তু করে কবিতা লিখবেন।

এ যুগে আমরা হচ্চি ভাইটামিন-পাগল। ভাইটামিন A to Z- এর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চি এবং কোথাও একটু ভাইটামিনের খোঁজ পেলেই তাতে দিচ্চি bite, কখনো বা শরীরে সূঁই দিয়ে ফুঁড়চি, বা জল দিয়ে টপাটপ ভাইটামিন গুলি গিলচি। মানে ভাইটামিনের খাতিরে আমরা অখাদ্যকেও সুখাদ্য বলে বরণ করে নিতে মোটেই কুণ্ঠিত নই। কারণ স্বাস্থ্যই সম্পদ, স্বাদটা কিছুই নয়।

এই স্বাস্থ্যের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ নাকি নিমপাতা বেটে তার রস খেতেন। এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কচু সেদ্ধ করে নিজে তো খেয়ে পরখ করেছিলেন – তাঁর ছাত্র শিষ্যদেরও খেতে প্ররোচনা দিতে ভোলেননি। শুনেচি, তাঁরা সে কচুর ঘ্যাঁট সামনে গিলেচেন এবং আড়ালে যে কী করেচেন তা না বলাই ভালো।

আসলে বিকল্প খাদ্যের সন্ধানে আমরা সবাই সন্ধানী। মাননীয় মন্ত্রীরা, মাননীয়া গৃহিণীরা, পত্রিকায় মহিলা বিভাগের পরিচালিকারা এবং রেডিয়োর মহিলা মহলও এ বিষয়ে কম উৎসাহী নন। তবে সে সব খাদ্য উপদেশ বা রন্ধন কথিকা পড়ে বা শুনেই খালাস হওয়া যায়, এই যা রক্ষে। কিন্তু ঐ সব বিকল্প খাদ্যের প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেসন দিতে এলেই হয় বিপদ।

আমার এক বন্ধু তার স্ত্রীর আবিস্কৃত ফর্মুলায় তৈরি একটি বিকল্প খাদ্য মুখে তুলতে গিয়ে 'এ্যাক থুঃ' করে ফেলেছিলো, আর সেজন্যে তার স্ত্রী নাকি তখুনি হাতের খুন্তি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উনুন থেকে কড়াই উল্টে দিয়ে রিকসা ডেকে এক কাপড়েই চলে গেছলেন বাপের বাড়ি! ফিরেছিলেন সাতদিন বাদে।

সাতদিন বন্ধুবরকে বহু জায়গায় বহু রকমের বিকল্প খাদ্য খেয়ে খেয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিলো।

অর্থাৎ বন্ধুবর ভুলে গেছলো—no risk no gain একই জিনিস আবহমানকাল ধরে খেতে হবে তার কী মানে আছে? তাতে গার্হস্থ্য শান্তির বিঘ্ন তো ঘটেই, মানসিক শান্তি, অর্থনৈতিক শান্তি, জাতীয় শান্তি—অনেকরকম শান্তির বিঘ্নও ঘটতে পারে।

না, বিকল্প খাদ্য ব্যবস্থা আমাদের দরকারই।

দরকার জেনেই কবি সুকুমার রায় তাঁর 'খাই খাই' কবিতায় অনেক আগেই অনেক রকম খাদ্যের লিষ্টি বাতলে দিয়ে গেচেন। অনেকেই বলবেন, সেগুলি অবাস্তব, অপৈটিক · পেটের জন্যে নয়। তা হোক, ক্ষতি নেই। সে সব খাই যখন, তখন খাদ্য সেগুলো নিশ্চয়ই।

ইদানীং এই বিকল্প খাদ্য নিয়ে আমিও মাথা ঘামাচ্ছিলাম। এ নিয়ে গৃহিণীর সঙ্গে আমার বহুবার রীতিমত গভীর এবং সরব--দু-রকমেই আলোচনা হয়ে গেচে। তাঁর ফরমুলায় রান্না আমি বুদ্ধিমানের মত হাসিমুখেই খেয়েচি, আর মিথ্যে বলবো না, তিনিও আমার ফরমুলায় রান্না করে তা হাসিমুখেই চেখে দেখেচেন, অথচ তাঁর চোখে জল দেখিনি। এইভাবে বিকল্প-খাদ্যের হদিস

দিতে পারেন বা চালু করতে পারেন— সংসারের এই সব অধিষ্ঠাত্রী দেবীরাই।

তবে সেদিন আসল বিকল্প-খাদ্যের খোঁজ হঠাৎ আমি পেয়ে গেলাম। আমার ভাগ্নে গাবলুর 'খাপছাড়া' বইখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা দেখে চমকে উঠলাম আমি। শুয়ে শুয়ে পড়ছিলাম। তড়াং করে লাফিয়ে উঠলাম আনন্দে —ইউরেকা! পেয়েচি! ঘাস!

দূরদ্রষ্টা বিশ্বকবি লিখচেন—

'ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।
অনুকুলবাবু বলে, ঘাস খাওয়া ধরা চাই,
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যাস করা চাই,
বৃথাই খরচ করে চাষ করা শস্য॥'

রবীন্দ্রনাথের চেনা এই অনুকুলবাবু অবশ্য ঘাস খেয়ে খেয়ে মারা গেছলেন। তা মরুন। প্রথম প্লেন চালাতে গিয়ে মানুষ মরেনি? ওষুধ আবিষ্কার করতে গিয়ে মানুষ প্রাণ দেয়নি?

আমি অধৈর্য হয়ে খোঁজ করতে লাগলাম, আর কেউ বিকল্প খাদ্য হিসেবে ঘাসের কথা বলেচেন কিনা। রিসার্চ করতে গিয়ে দেখি 'পরশুরাম' ছদ্মনামে বৈজ্ঞানিক রাজশেখর বসুও লিখেচেন—

'আজ আমাদের আলোচ্য, Eat more grass.
অর্থাৎ আরো বেশি ঘাস খান প্রতিদিন,
কারণ, ঘাসেই পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বলাধান,
ঘাসেই হবে অন্ন সমস্যার সমাধান।'

দেখি, জনপ্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশও কবিতায় ঘসের প্রশস্তি গেয়ে গেচেন—

'সুরঞ্জনা, তোমার হৃদয় আজ ঘাস:
বাতাসের ওপরে বাতাস,
আকাশের ওপরে আকাশ।'

এই সব দেখে মনে হলো, খোলা হাওয়া আর ঘাস খাওয়াতেই সব সমস্যার সমাধান, পরম শান্তি। তাই আবেগে আমিও দু'ছত্র কবিতা লিখে

দেখলাম—

আমি চাই নীচে ঘাস,
উপরে আকাশ
স্বস্তির নিশ্বাস ॥

গোপনে বলি, এই ঘাসের উপর আমি একটা থিসিস লিখবো ঠিক করেচি। তার দু'একটি পয়েন্ট জানাই –

১। ঘাস খেয়ে গাভী যদি দুগ্ধবতী হয়, তবে মানবীরাও নিশ্চয়ই দুগ্ধবতী হবেন। তাতে আর বেবীফুডের জন্যে ভাবতে হবে না। আর দুধের সমস্যা মিটে গেলে বাজারে সন্দেশ রসগোল্লার সাইজ বড় হবে অথচ দাম বাড়বে না।

২। ষাঁড়েরাও ঘাস খায় এবং সেজন্যে খুব শক্তিশালী। এমন কি বাঘ সিংহের চাইতেও খাটাখাটনিতে গো-জাতীরাই উল্লেখযোগ্য। অতএব তরুণদেরও ঘাস খাওয়া দরকার। যাতে ষাঁড়ের মত তেজী হয় এবং তরুণীদের পেছনে অক্লান্তভাবে ঘুরতে পারে।

৩। পচা মাছ বা বাসি মাংসের চাইতে ঘাসের চপ বা কাটলেট আরও বেশি স্বাস্থ্যকর। উপাদেয়ও বটে।

৪। ঘাসের জন্য তেমন চাষেরও প্রয়োজন নেই। অথচ এই ঘাস বিদেশে রপ্তানী করতে পারলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাবে। কারণ বিদেশে বহু জায়গা বরফ আচ্ছাদিত থাকায় এবং বহু জায়গা মরুভূমি থাকায় ঘাসের চাহিদা নিশ্চয়ই সেখানে খুব বেশি।

৫। এইভাবে এই বিকল্প-খাদ্যের দ্বারা আমরা আমাদের খাদ্য সমস্যা মেটাতে তো পারবোই, দেশকেও সুসমৃদ্ধ করতে পারবো এবং দেশ হয়ে উঠবে গরু মতই শান্ত, শান্তিময়, আর লোকেরা হবে ওদেরই মত কর্তব্যনিষ্ঠ।

এই ঘাস খেয়ে রবি ঠাকুরের অনুকূলবাবু মারা গেলেও, এই ঘাসের অনুকূলে আরো অনেক পয়েন্টস আমার ভাঁড়ারে মজুত আছে। সে সব আর বললাম না। কারণ এই থিসিস মেরে দেবার লোকের তো আর অভাব নেই এই পোড়া দেশে।

গোলালু

এক জাপানী বৈজ্ঞানিক প্রচার করেছেন— 'আলু মাহাত্ম্য'। আলু— বিশেষ করে গোল-আলু বা সর্টে 'গোলালু' নিরামিষ-রাজ্যে তরকারির মধ্যে রাজা। অতএব গোলালুর রাজকীয় গুণ-বর্ণনা না করা অপরাধ।

জাপানী বৈজ্ঞানিক মশায় বলেচেন, চালের চাইতে আলুই নাকি উপাদেয় আর স্বাস্থ্যকর। অথচ বৈজ্ঞানিক মশায় যখন জাপানী, তখন আমাদেরই মতন নিশ্চয়ই 'ভেতো'। অথচ তিনি আলু-গুণে পঞ্চমুখ হলেন!

শোনা যায়, জাপানী প্রথায় ভারতীয় মাটিতে রীতিমত ধান পাওয়া যাচ্চে এবং এমত অবস্থায় যদি কোনো জাপানী বৈজ্ঞানিক পঞ্চাশ বছর যাবৎ আলু-সাধনা করে সহসা আলুর মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তবে আমাদেরও উচিত অল্প নয়, বিস্তৃতভাবেই আলু নিয়ে জল্পনা-কল্পনা ও পরিকল্পনা শুরু করা।

বৈজ্ঞানিক-প্রবর বলেচেন, আলু নাকি পুরুষকে দয়ালু করে, দীর্ঘজীবি করে, মিশুক করে এবং নারীকে পরিচালনা করবার ক্ষমতা দান করে (আহা!) এবং আলু-ভোজিনী কুলবতীরা নাকি অশেষ গুণবতী হন (কিমাশ্চর্যম!) — অতএব মাছ যদি আজ আমাদের কাছে আলেয়া হয়ে দাঁড়ায়, ক্ষতি নেই, আলু আমাদের অন্ধকার ভোজন-পথের ফ্লোরেসেণ্ট আলো হোক।

এই আলু-সংবাদ আমাদের কর্তাদের কানে এবং প্রাণে পেঁছেচে কিনা জানিনে, তবে পেঁছলেই শুরু হবে আলু নিয়ে আলোড়ন। আমাদের অভিভাবকরা তখুনি উপদেশ দিতে শুরু করবেন, অধিক আলু ফলাও, হরদম আলু খাও ও খাওয়াও এবং ঘাটে মাঠে বাটে আলু-আলোচনা করো। আলু-আলু! আলুই জীবনের আলো, আশার আলো। আলু সাধু, আলু স্বাদু, আলুর মধ্যে যাদু আছে। আলু বঁটিতে বা ছুরিতে অনেক রকমে কোটা

যায়···দমের জন্যে, ডালনার জন্যে, ভাজার জন্যে, চচ্চড়ির জন্যে এবং ব্যাকরণিক ভাগে দাঁড়ায়—না+লু=আলু। অর্থাৎ আলু খেলে গায়ে লু লাগবার ভয় নেই।···অতএব জাপানী প্রথায় আলু চাষ করা হোক এবং 'জয় আলু' প্রচারের জন্যে (পাচারের জন্যে নয়) প্রচুর অর্থব্যয় মঞ্জুর করা আশু প্রয়োজন।

দরকার হলে এই আলুকে রাজনীতিতে টেনে আনতে হবে। রাজনীতি যখন আমাদের হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে গেচে এবং আলু হাঁড়ি-হেঁসেলেই চালু, তখন আলু রাজনৈতিক হতে বাধা কি? আলু নিজে ভোটে না দাঁড়াক, ভোটের প্রতীক হতে পারে—আলু নিয়ে স্লোগান দেওয়া যায়ঃ আলু চালু করতে হবে, আলুর ভ্যালু মানতে হবে। কিংবা আলুর গুণে সর্ব জয়, আলুর দোষ, দোষই নয়।—ইত্যাদি! আর দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা যেতে পারেঃ আলুর মাধ্যমেই আমরা আনবো সাম্যবাদ, ঘুচাবো আমরা বাদানুবাদ!

সত্যিই তো, পিং পং যদি রাজনৈতিক ভেদাভেদ ঘোচাতে পারে, তবে আলু পারবে না? পিং পং-এর বল গোল, আলুও গোল আর পৃথিবীটাও গোল—কাজেই পৃথিবীর গণ্ডগোল ঐ গোলাকার কিছু দিয়েই মিটবে। এই গান্ধীমার্কা অহিংসুক গোলাকার কিছু দিয়ে হিংসুক গুলি-গোলা দিয়ে নয়। এসব কথা গোলা লোকেরাই বোঝে না।

এখন কথা হচ্চে, ঐ মানব প্রেমিক দয়ালু জাপানী বৈজ্ঞানিক মশায় কোন আলুর কথা বলেচেন? শাঁকালু, লালালু না গোলালু? তা জানিনে। তবে মনে হয়, খৃষ্টাবতার যীশু শীতকালে নাকি শাঁকালু খেয়ে থাকেন, অতএব ওটি তাঁরই খাদ্য হওয়ায় জাপানের বৌদ্ধ-বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই ঐ জাতীয় আলুর কথা বলেন নি। লালালুও ঐ শীতকালেই পিঠে তৈরিতে চালু। অর্থাৎ ঐ জাতীয় আলু আমাদের সেকালীন দিদিমা, ঠাকুমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। সেকারণে বিদেশী (হলেই বা প্রাচ্য দেশীয়) ঐ বৈজ্ঞানিকের এই লালালুর কথা না জানাই সম্ভব। উপরন্তু এই দুই জাতীয় আলুই দেখা যাচ্চে শীতকালেই ভক্ষ্য। অথচ এই শীতকালে ছাড়া অন্য কালগুলোয় আলুর আকাল হবার কথা নয়। আর আকাল যাতে না হয়, তাই অকালে ও সর্বকালে এই গোলালুর আবির্ভাব। মানবজীবন রক্ষার্থেই বুঝি এই অতি দরকারি তরকারি দয়ালু গোলালুর মহাজন্ম, না, আবির্ভাব!

গোলালু স্বাস্থ্যপ্রদ, শক্তিপ্রদ। ভক্ষণে উদ্দাম উদ্যম পাওয়া যায়। সেজন্যেই আলুর দম এত বিখ্যাত। মুড়ি-মিছরিকে এক করার মতই আগে নিমন্ত্রণ বাড়িতে মাছের সঙ্গে আলু পরিবেশন করা হতো। কিন্তু মাছের অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব কিছুই নেই (একথা আর আর কারোর কাছে অবিদিত আছে ?)--অথচ এই আলুর গুণাবলী আগের মত আজও স্বীকৃত, সম্প্রতি উচ্চ-প্রশংশিত (মনে যেন কেউ না করেঃ মাছ মাংস আণ্ডার অভাব হওয়ায় বা দাম বেড়ে যাওয়ায় এসব আলুর প্রপাগাণ্ডা !)—হ্যাঁ যা বলছিলাম, তাই বোধহয় আলু-ভক্ত মানবরা নিমন্ত্রণবাড়িতে আজকাল মাছের সঙ্গে আর আলু পরিবেশন করে না—আলুকে সযত্নে আলগোছে আলাদা করে নিমন্ত্রিতদের পাতে দেওয়া হয়। এটা আলুর—মানে, গোলালুর স্পেশাল খাতির বলেই ধরা উচিত। গোলা লোকেরা গোলালুর এই মর্যাদা পাছে না বোঝে—তাই এই বিশ্লেষণ !

আগেই বলেচি, আলু উদ্দাম উদ্যমের উৎস। পুরীর জগন্নাথদেব কলাটা মুলোটা খান, কিন্তু আলু খান না বলেই আজ তিনি ঠুঁটো, কর্মশক্তিরহিত।

আলু যে মাননীয় তা আরো বোঝা যায়—কচু, কাঁচকলা, বা কুষ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলে। আমরা বিশেষ বিশেষ সময়ে অনেককে কচু-পোড়া খাবার উপদেশ দিই, কাঁচকলা বা কলাপোড়া খাবার নির্দেশ দিই এবং অনেককেই অকাল-কুষ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করি, কিন্তু আলুকে নিয়ে আমরা কখনোই এলোমেলো কথা বলিনে। বলিনে, কারণ আলু নিম্নশ্রেণীর আলোচনার বিষয় নয়।

তাছাড়া, আলুর সঙ্গে, বিশেষ করে গোলালুর সঙ্গে মানুষের বেশ একটা মিল আছে, মানে একটা মাখামাখি ভাব আছে ভাবলেও চলে। এমন কি গোলালুর সঙ্গে বহু মানুষের মুখের আদলও দেখতে পাওয়া যায় (অন্তত শিল্পীরা দেখতে পান)। দাড়ি কামালে পুরুষদের মুখের সঙ্গে খোসা ছাড়ানো আলুভাতের কোন তফাৎ নেই !

আলুর মতই অনেক মানবদেহধারীকেও সর্বঘটে ও সর্বঘটনায় নাক গলাতে দেখা যায়। তাছাড়া গোলালুর চোখ আছে, মানুষেরও। আবার গোলালুর চোখ থাকতেও গড়াগড়ি যায়, মানুষও তালকানার মতই। গোলালু ঘরে থাকলে তার কল্ গজায়, বসে থাকা মানুষের গজায় কল্পনা। গোলালু ছড়ানো বালিতে ভালো থাকে, মানুষও স্বাস্থ্যের জন্যেই ছোটে সমুদ্রতীরে বালির

আশায়। সম্প্রতি গোলালু ঠাণ্ডা ঘরে থাকচে দেখে মানুষও পাখার হাওয়ার বদলে ধরেচে ঠাণ্ডাঘরের ফ্যাশান।

এহেন গোলালুর সঙ্গে যদি আমরা ঐ জাপানী বৈজ্ঞানিকের মতানুযায়ী পৈটিক সম্পর্ক পাতাই তবে আমাদের দেহমনের আলসেমী অচিরাৎ দূর হবে, আমাদের আলুথালু ভাব বিদূরিত হবে, আমাদের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকীরণ হবে—কোন শয্যাশায়িতা কেশবতীর আলুলায়িত কেশসম্ভারের মতই! (এখানে যে কোন তেলের বিজ্ঞাপনের ছবি কল্পনা করা হোক।)

অতএব হে গোলালু! জাপানী বৈজ্ঞানিক শ্রীযুত কুরিয়ামা-র সঙ্গে এই আলু-প্রেমালু কুমারেশেরও লহ নমস্কার।

আলো, এতটুকু আলো—

ঘরের আলো গেল নিভে।

ঘরের কেন, সারা বাড়ির।

জানলা দিয়ে দেখি, সারা বাড়ি শুধু নয়, সারা পাড়াটা অন্ধকার। হয়তো সারা সহরটাই।

হয়েচে ভালো!

আলো আজকাল এলোমেলো। কখন নেভে কখন জ্বলে তার ঠিক নেই।

জ্বালাতন!

হয়তো কোথাও লাভ-লোকসানের দু' নম্বরি খাতা লেখা চলচে, কাল ইনকাম ট্যাক্সে দেখাতে হবে, কিংবা হয়তো চলচে সিনেমার পর্দায় প্রেম নিবেদন অথবা বিয়ে বাড়ির ছাতনা তলায় সবে শুভদৃষ্টি হচ্ছিলো, বা ঐ বিয়ে বাড়িতেই এক ভোজন রসিকের পাতে গণ্ডায়-গণ্ডায় লেডিকেনি দেওয়া হচ্ছিলো - এমন সময় আলো গেল নিভে!

আলো যে কখন কোথায় কী ধরণের ইয়ার্কি মেরে বসে তা কারোর জানবার উপায় নেই।

কবি মিল্টন অন্ধ ছিলেন, তাই হয়তো বলেছিলেন, Light, more light, কিন্তু তিনি জানতেন না হয়তো, আলো পেলে আলো হারানোর দুঃখ! যা আমরা বুঝচি হাড়ে-হাড়ে।

রবীন্দ্রনাথ লেখেছিলেন, আলো, এতটুকু আলো, দাও গো আমারে দাও গো! আমার মনে হয়, তিনি হয়তো কাগজ কলম নিয়ে সবে সন্ধ্যাবেলায় লিখতে বসেছিলেন, এমন সময় আলো গেল নিভে। তাঁর মাথায় সবেমাত্র একটা

ভাব এসেছিলো। তিনি করুণ সুরে আর্তনাদ করে উঠলেন, আলো এতটুকু আলো দাও গো আমারে।

এইখানেই কবির সঙ্গে আমাদের মত অ-কবিদের তফাৎ। আমরা হলে রেগে গিয়ে বলতাম, শালার আলো, কোথায় গেলো? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রায় ঐ ভাবটাই কেমন সুন্দর ভাষায় রূপ পেলো!

কিন্তু আলোর জন্যে এত প্রার্থনা কেন? এত আকুলি-বিকুলি কেন?

আমাদের পূর্বপুরুষরা তো এই অতি-আলোর বিজলী বাতি ছাড়াই কত কিছুই করেচেন।

আগে মানুষ অন্ধকারেই তাদের জীবনের পথে চলেচে। অন্ধকারেও তাদের পথ হাতড়াতে হয়নি। দৃঢ় পদক্ষেপেই এগিয়ে গেচে। লক্ষ্য ভ্রষ্ট বা আদর্শ ভ্রষ্টও হয়নি। তখন চাঁদনী রাতটুকুই তো ছিল ফ্লোরেসেন্ট আলো। সেই চাঁদনি রাতেই মনে জেগে উঠতো কত কাব্য! আর ঐ অন্ধকারেই দেখতে পেতো তারা আশার আলো। ভবিষ্যৎ।

আর আজ? হাজার বাতির মাঝখানেও আমরা দিশেহারা। পথ হারিয়ে বেড়াচ্চি। আশার আলো কই?

আলো-অন্ধ হয়ে গেচি আমরা।

বাইরে আলোর হাতছানি, তাই মন অন্ধকার। মনের কপাট বন্ধ।

শুনেচি রাস্তার অল্প আলোতেই নাকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম পাঠ শুরু হয়েছিলো, যখন পণ্ডিত হয়েছিলেন, তখনও কলকাতায় মোমবাতির ঝাড় আর রাস্তায় কেরোসিনের আলো। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালজয়ী উপন্যাসগুলো হয় মোমবাতির আলোয় কিংবা কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্পে লিখেছিলেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা কালিদাসের কুমারসম্ভব, রঘুবংশাদি লেখা হয়েছিলো রেড়ির তেলের আলোয়। আর মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এ কোন আলোই তো দরকার হয়নি, মনের আলোতেই তা লেখা হয়েছিলো।

আর আজ আমরা ষাট পাওয়ার বাতির টেবিল ল্যাম্পের তলায় বসে কী লিখচি? কালজয়ী কিছু?

কাজেই আলোটাই বড় নয়।

ভালোই হলো, আলোটা নিভে গেল।

সদর দরজা বন্ধ হলো। খুলে গেল মনের দরজা। কাগজ-কলম পাশে রেখে বিছানায় এলিয়ে দিলাম নিজেকে। চোখ মেলে চেয়ে রইলাম অন্ধকারের

দিকে। আহা, অন্ধকারেরও যে এমন রূপ আছে তা কী আগে জানতাম! (শরৎচন্দ্র অবশ্য একটু জানিয়েচেন) এ যেন কালো মেয়ের রূপ। আলো করা।

আমি যেন নিজেকে খুঁজে পেলাম।

এতদিন আলোর হাতছানিতে নিজেকে ছড়িয়ে দিতাম বাইরে—আর সকলের মতোই। আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই যেন ঘরছাড়া, আমিও। সিনেমা থিয়েটার, ক্লাব, সভা, কাফে রেস্টুরেণ্ট—সব তখন সরগরম। নাইট ক্লাবের কথা ছেড়েই দিলাম।

কথায় আছে, পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে। আলোর চারধারে ঘোরে আর মরে। আমাদেরও অবস্থা যেন তাই। আলোর চারধারে ঘুরি আর ঘুরি। অবশ্য মরি না, মারাই। পকেট।

শুধু আলো, আলো, আলো।

মিল্টনের light, more light যে এত মারাত্মক হয়ে উঠবে, তা আগে কে বুঝতে পেরেচে? সেই চকমকি ঠুকে আলোর জন্ম, তারপর থেকেই আলোর বয়স যত বাড়তে লাগলো, তার তেজও তত বাড়তে লাগলো। আর তেমনি *আমাদের চোখেও পড়তে লাগলো ছানি—মানে, পর্দা। চোখের সে 'পর্দা' নয়! সে চোখের পর্দা থাকলে তো ভালোই হতো। তবে শুনেচি, আজকাল ঐ চোখের পর্দাটা থাকা নাকি কোন কাজের কথা নয়। না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।* তাতে self-অগ্রগতির পথে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে জীবনের রথের speed বাড়ানো যায়।

যাক, যা বলছিলাম। আলোর তেজ বাড়তে লাগলো।—যেমন চকমকির ঝিলিক আলো থেকে রেড়ির তেলের প্রদীপ, মোমবাতির আলো, হ্যারিকেনের আলো, গ্যাসের আলো, পেট্রোম্যাক্স, ইলেকট্রিকের আলো—দশ, পঁচিশ চল্লিশ, ষাট, একশো পাওয়ারের, তারপর ফ্লোরেসেণ্ট আলো, ভেপার ল্যাম্প, *মার্কারি ল্যাম্প কত কী! চোখের পর্দা ততদিনে কেবলই মোটা হতে লাগলো* এবং মন বলতে লাগলো, light, light more light. আলোকের ঐ ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও—ধুইয়ে দা—ও—উ—উ!

এ হেন অবস্থায় যদি no light ব্যাপার ঘটে যায়, তখন মনের অবস্থাটা কী *হয়—তা ইলেকট্রিক কোম্পানীর অ-কৃপায় সকলেরই বোধগম্য।*

আমারও তাই হলো! হায় কী হলো অবস্থা। মোমবাতি কিনে আনু, হ্যারিকেন থাকে তো জ্বালা, টর্চ কই ইত্যাদি ভাব।

আচ্ছা, এই শিল্পগুলোকে তেজী কবরার জন্যেই বিজলীর তেজ কমিয়ে দেওয়া নয় তো ?

কিন্তু তখনই মনকে থাবড়া মেরে থামিয়ে দিলাম : চুপ কর্। হোক না অন্ধকার ! আলো তো অনেক দেখেছিস, দ্যাখ না একটু অন্ধকার। বলি বনে তো নেই, তবু মনে এত ভয় কেন ?

আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

দেহটাকে বিছিয়ে দিলাম বিছানায়, মনটাকে গুটিয়ে নিলাম ভেতরে। নিজের মনে—মনের মধ্যে জাবর কাটতে লাগলাম।

এমন সময় গৃহিণী ঢুকলেন ঘরে। হাতে মোমবাতি।

মোমবাতির আলোয় প্রেয়সীর মুখখানি অপরূপ হয়ে উঠলো।

গৃহিণী মোমবাতি হাতে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়াতেই ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলাম আলোটা। আলতো করে ধরলাম গৃহিণীর নরম হাতখানা, নরম গলায় বললাম, এসো, কাছে বসো, গল্প করি।

গৃহিণী ঝটকা মেরে বললেন, হ্যাঁ গল্প করবারই সময় বটে !

নইলে এই অন্ধকারে কী করবে এখন ? — বললাম : কোথাও হোঁচট খেয়ে পড়বে'খন। তার চাইতে বরং—

গৃহিণী হয়তো মনে-মনে বুঝলেন কথাটা। আলোর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া, আর আলোর পেছনে ছোটাছুটি করা এখন থাক বরং। থাক কাজ পড়ে। একটু অবকাশ যখন পাওয়াই গেল—

প্রেয়সী বসলেন এসে আমার পাশেই।

মনে মনে হাসলাম, আলো থাকলে আমি এতক্ষণ কলম হাতে কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে থাকতাম আর গৃহিণী রান্নাঘরে খুন্তি হাতে কড়াইয়ের ওপর।

অথচ এই অন্ধকারে—

কেমন দু'জনে মুখোমুখি গভীর সুখে সুখী—

পরম সুখে শুরু করলাম পুরোন দিনের প্রেমের কথা। প্রণয় করে পরিণয়ের পরিণতি হয়নি বটে, বরং হয়েচে পরিণয়ের পরিণত প্রণয়। যাকে ব'ল বিয়ের পরে ভালবাসা। কিন্তু বিয়ের পর সেই ভালোবাসার কথা বলবার সময় পেয়েচি নাকি এতদিন ? এতদিনে এই ক্ষণে হঠাৎ অন্ধকারে পেলাম যেন সেই সুযোগ। মনে এলো, বিয়ের সম্বন্ধের কথা, পাকা দেখার কথা, বর সেজে

ছাতনাতলায় গিয়ে আসল দেখা বা শুভদৃষ্টির কথা, বাসরঘরের কথা, এবং ফুলশয্যার কথা—

ঢং। কচি খোকা! বুড়ো বয়েসে রস দ্যাখো না! —ইত্যাদি মন্তব্য করতে লাগলেন গৃহিণী আমার এই মিষ্টি মধুর কথাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। আর সে মন্তব্যও মধু-ঝরা। তাঁর নরম হাতখানা আমার হাতের মধ্যে তখনও ধরা।

এমন সময় হঠাৎ আলোর ঝলকানি।

বেরসিকের মতো আলো জ্বলে উঠলো।

গৃহিণী ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন ধনুকের ছেঁড়া ছিলার মত।

অন্ধকারে স্বর্গে উঠেছিলাম, আলোর ধাক্কায় ধপাস করে পড়লাম এই পৃথিবীতে। স্বর্গ হতে বিদায়।

তবু হে অন্ধকার, তোমাকে নমস্কার!

আমরা অন্ধ। তাই অন্ধকারকে ভয় করি।

এ যুগের আমরা

আসলে এযুগের আমরা এক অদ্ভুত জীব।

সারা জীবন ধরে শুধু জীবন ধারণের সমস্যা। একালীন উপমা দিতে গেলে বলতে হয়, এযুগের আমরা প্রত্যেকেই যেন এক-একটি স্যাণ্ডুইচ : অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক রুটির স্লাইসের মাঝে চেপ্টানো খানিকটা মাংসের কিমা। অতএব এমন লোভনীয় বস্তুটি পাছে কে কখন কোথা থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, তাই বীমার ঢাকনিতে তুকতুক করে তাকে ঢেকে রাখতে হয়— সারাক্ষণ পথে গাড়ি-ঘোড়া (না, সেকেলে ঘোড়ার নামে এখন আর বদনাম দেওয়া উচিত নয়) –বরং বলা যাক, ডাঙ্গায় মোটর, বাস, লরি—হাল আমলের বোমা, পাইপগান ইত্যাদির সঙ্গে হঠাৎ-স্নেহালিঙ্গন, কিংবা জলে জাহাজ আর আকাশে প্লেনের সঙ্গে সহমরণ—কোনটা যে কবে কখন আমাদের কপালে নাচচে তা দেবা ন জানন্তি!

বাড়ির চৌকাঠের ওধারে গিয়ে ফের অক্ষত দেহে এধারে ফিরে আসা আজকের দিনে ব্যাচেলর অব আর্টস বা মাস্টার অব আর্টসের চাইতেও শক্ত আর্টের পরীক্ষা। পদে-পদে সেই চলার আর্টের চালাকিটাই চালু। রাস্তা পার হতে গেলে ঠিক কতটা গিয়ে ডাইনে ঘাড় বেঁকাতে হবে এবং কতটা গেলে বাঁয়ে, কিংবা ভরপুর চলন্ত বাসে কেমন করে ঠিক তাকমত ডান পায়ের খানিকটা ফুটবোর্ডে লাগিয়ে ধাঁ করে পেন্সিল-পালিশ বাঁকা হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরে দেহটাকে দুলিয়ে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—তা কোন স্কুলের সিলেবাসে নেই। সেজন্যে কোন কোচিং ক্লাস বা শর্টকাট নেই। বরং শর্টকাট করতে গেলে যেখানে যাবার শর্টকাট রাস্তাটা হঠাৎ পাওয়া যায়, সে স্থানটি মোটেই নাকি লোভনীয় নয়।

কিন্তু তা বলে কি আমরা চুপচাপ ঘরে বসে থাকি ? না। এযুগের আমরা ভীরু নই। যন্ত্রদানবের সঙ্গে আমরা সকাল-সন্ধ্যা কুস্তি করি। কুস্তি নয়, যুযুৎসু। কুস্তিতে গায়ের জোর দরকার, যুযুৎসুতে প্যাঁচ। এই বিজ্ঞান-বুদ্ধির মার-প্যাঁচে কখনো তাকে আমরা ধরাশায়ী করি, আর কখনো আমরাই ল্যাং খেয়ে মরি। তবু যন্ত্রীই আমাদের সদাসঙ্গী, মন্ত্র আমরা মানিনে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ফিরে দাও সে অরণ্য'। কিন্তু সেই অরণ্য ফিরে পেলেও যন্ত্র-সভ্যতায় বিশ্বাসী আমরা—সত্যিই কি সার্ট-প্যান্ট বা নায়লনের শাড়ি ফেলে বল্কল পরে ছুটতাম বনে ? না, ব্রেস-কাটলেট আর ডবল-ডিমের অমলেট রেখে খেতাম বনের ফল-মূল !

তা কবির প্রার্থনামত অরণ্য তো আমরা পেয়েচি ঃ দণ্ডকারণ্য। সেখানে গিয়েচিও আমরা অনেকেই। কিন্তু কই, সত্যযুগের সেই শ্রীরামচন্দ্রের মত বনবাস না করে বনটাকে উপবন করবার জন্যে আমাদের কতই না চেষ্টা। বিরাট বুলডোজারের ধাক্কায় শেকড় সুদ্ধ গাছগুলো কুপোকাৎ ! আর শুনেচি, হিংয়া কা মাটি হুঁয়া হচ্চে হরদম। কলিযুগের যন্ত্র-তাড়নায় সেই সত্যযুগের অরণ্যের চলেচে দণ্ডভোগ। তার রোদন আজ 'অরণ্যের রোদন'।

আসল কথা, সেই অরণ্য বা বন্য-যুগ থেকে আমরা এসেচি যন্ত্র-যুগে। দুই যুগে আকাশ পাতাল ফারাক। সে যুগের কাঠ কেটে কাঠের ফার্ণিচার বানাবার সখ আর আমাদের নেই। ষ্টিল ফার্ণিচারের দিনও বুঝি যায়-যায়। প্লাস্টিক এখন সর্বঘটে। জলে ডাঙায় আকাশে আমরা লম্বা দৌড় অনেক দিয়েচি, তাই দৌড় এখন উর্দ্ধে—চন্দ্রালোকে। টম-টম যুগের জীবনধারা এই এটম যুগে একদম অচল।

এযুগের আমাদের জীবনধারা আর ধীরে বয়ে যাওয়া নদীর স্রোতের মত নয়। কলের জলের পাইপের ভেতর দিয়ে জীবনধারার যাতায়াত। সময় মাফিক মাপা জলের ব্যবস্থা। এখন মাপা রেশন, মাপা ফ্যাশন। মাপা কাশি, মাপা হাসি। ফ্ল্যাটবাড়ির মাপা ঘরেই আমরা চৌকোশ। মাপা আমরা আচার-ব্যবহারেও।

প্লেনের কৃপায় আমরা 'বাহির করিনু ঘর'- অথচ পাশের ঘরের বা ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক আমার অপরিচিত। সানাই শুনে বা ডাস্টবিনে এঁটো পাতা

গেলাস দেখে বুঝি কোথাও কিছু ঘটেচে। এঘরে যখন মৃত্যুর বিভীষিকা, ওঘরে তখন ঢেউ-খেলানো সিনেমা-গান।

আমাদের কাছে পাড়া বেড়ানো হলো অসভ্যতা, লোকের খবর নেওয়া অভদ্রতা। নিমন্ত্রণের চিঠি মানেই আতঙ্ক। আত্মীয়-স্বজন উপদ্রব, উন্মুক্ত সদর দরজা নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ।

আমাদের যা কিছু সম্পর্ক ঘড়ির সঙ্গে। ঘড়ি আমাদের কাছে ঘরোয়া। তার নির্দেশ মতই আমাদের ওঠা-বসা। ঘড়ির সঙ্গে হাত মিলিয়েই পা চালানো। তবু পাল্লা দিয়ে পারিনে। ঘড়ি তার দুহাত ঘুরিয়ে বলেঃ সময় নেই, সময় নেই, আরো দৌড়োও। কেবল চোখ রাঙায়, ঐ হারালে তুমি। তাই হারাবার ভয়ে ছুটতে হয় ঘোড়দৌড়।

অফিসে ছুটতে হয় চাকরী হারাবার ভয়ে, বাজারে ছুটতে হয় টাটকা কিছু হারাবার ভয়ে, সিনেমায় ছুটতে হয় আনন্দটুকু হারাবার আশংকায়। তবু কত কী যে হারিয়ে বসি তার হিসেব কে রাখে!

ঘড়ির মুখ ঘুরিয়ে রেখে খেয়ালমত আড্ডা জমিয়ে রসিয়ে-রসিয়ে গল্প করা দুপুর বেলায় খেয়েদেয়ে পান মুখে দিয়ে বিছানায় শুয়ে নভেলখানার কয়েক লাইন পড়তে পড়তে মিষ্ট ঘুমে ঢুলে পড়া, আবার বিকেলে উঠে ময়নার খাঁচাটার সামনে গিয়ে শিস দিয়ে তাকে বুলি শেখানো, কিংবা হঠাৎ খেয়াল-খুশিমত লাঠির মাথায় বোঁচকা বেঁধে দুর্গা বলে এদিক-সেদিক বেরিয়ে পড়া এসব আজকের দিনে আমাদের কাছে রীতিমতই স্বপ্ন। স্বপ্ন নয় পাপ। অপরাধ। হাল্কা চালে চলা এখন দৃষ্টিকটু। গুরুগম্ভীর হয়ে শুধু কদম কদম বাঢ়ায়ে যা।

বেড়ে যাও, নইলে গেলে। তোমার পেছনে যারা, তারা তোমাকে থেঁৎলে দিয়ে চলে যাবে। আর তুমি যদি কারোর পা মাড়িয়ে চলো, ল্যাং মেরে এগিয়ে যাও, তাহলেই তুমি কীর্তিমান। কী করে হলে—সেটা বড় কথা নয়, তুমি 'হয়েচো' এইটাই বড় কথা। আজকের দিনে অতি ছোট হলে ছাগলে মুড়ে খাবেই কিন্তু এখন অতিবড় হলেও ঝড়ে ভেঙে পড়বার ভয় নেই, বরং ঐ ছাগলরাই করবে ব্যা-ব্যা, মানে, বাঃ বাঃ।

তাই তো এযুগের আমরা পা বাড়িয়েই আছি, ফ্ল্যাট রেসে দৌড়োচ্ছি প্রাণপণে। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের ফ্ল্যাটরেস। বিরাট কর্মক্ষেত্রের স্টেডিয়ামে এই আগে এগুবার রেস দিচ্চি আজীবন।

অফিসে আমার সহকর্মীর সঙ্গে হাসি, গল্প করি কিন্তু নজর. আমার উপরতলার চেয়ারখানার দিকে। অফিসের বড়বাবুর শ্রাদ্ধ করি মনে মনে. কিন্তু মুখে দেখাই শ্রদ্ধা। কারণ তাঁর কলমেই কর্মজীবন বাঁধা আমার। আমি কাজ করি, কিন্তু নিজের কার্যোদ্ধারের কথা ভুলিনে কখনো। আমি গদি চাই তাই গদি ছাড়বার হুমকি দিই। গাদায় পড়ে থাকবো কেন ?

আসল কথা, আমি কিছু চাই—অনেক কিছুই চাই। থাকলেও চাই, না থাকলেও চাই। সর্বক্ষণ দেহি-দেহি রব। গদি না দাও, বোনাস দাও, গৃহে কর্তৃত্ব দাও, বাইরে আধিপত্য দাও। নিদেনপক্ষে তোমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে দাও। না হয় অন্তত মাথায় হাত বোলাতে দাও।

এই দাও-দাও রব এ যুগের নয়, আদিম যুগের। তবে এটা দাও ওটা দাও বলে হরেকরকম্বা জিনিসের ফিরিস্তি এযুগের। তাই চাওয়াটাও রকমারি। সেকালে আমাদের আকাঙ্খা ছিল—রূপং দেহি জয়ং দেহি. যশো দেহি, দ্বিষোজহি, এখন ওসবের জন্য দেবীর কাছে বর প্রার্থনার দরকার নেই। রূপসজ্জার জন্যে আছে স্নো-ক্রীম, জয় নির্ভর করে চালাকির ওপর। যশ হয় রৌপ্য-রসে। আর শত্রু-নিধন ? কেন বোমা আছে না ?

না এযুগে আমাদের প্রার্থনাবলী অভিনব। দেহি-রব অন্যরূপে প্রকটিত : অফিসে প্রমোশন দেহি, বোনাস দেহি, অ্যাডভান্স দেহি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড দেহি। সেইসঙ্গে প্রিভিলেজ লীভ, ক্যাজুয়েল লীভ, মেডিক্যাল লীভ এবং ফাউ হিসেবে ফ্রেণ্ড-লীভ দেহি। ব্যবসায়ে লাভ দেহি, পারমিট দেহি, ক্যাপিট্যাল দেহি। পুজোর চাঁদা এবং জলসায় ডোনেশান দেহি। রাজনীতিতে প্ল্যাটফর্ম দেহি। সভায় সামনে মাইক দেহি, গলায় মোটা মাল্য দেহি। সাহিত্যে কলমের সুযোগ দেহি, আকাদেমি প্রাইজ দেহি। আরো আছে—বিদ্যায় লম্বা ডিগ্রী দেহি, কর্মে বিরাট উপাধি দেহি, খেলায় নামী শীল্ড দেহি, বিবাহে দামী যৌতুক দেহি। এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেহি।

আর ঘরে গৃহিণীর বা পুত্রকন্যার দেহি-দেহি রব তো এযুগ বা সেযুগের অতি-পবিত্র বা অতি-স্বাভাবিক শাশ্বত রব ! কাজেই সে আলোচনা বাহুল্যমাত্র।

এই দেহি-দেহি রব বন্ধ করবার সাধ্য বোধকরি উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ বা তৃতীয়পুরুষ—কোন পুরুষেরই নেই। তাই পুরুষের উপর ভার না দিয়ে অনেক মেয়েরাই সচেষ্ট হয়েচেন এ ব্যাপারে। তাই তাঁরা আর সন্ধ্যাবেলায়

তুলসীতলায় গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা না করে নিজেরাই সকাল-সন্ধ্যায় অফিসে গিয়ে কলম ধরেচেন। সংসারের হাল দেখেই এই হাল-ধরা।

কবি জয়দেব লিখেছিলেন, দেহি পদপল্লবমুদারম। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পদপল্লব পেলেই খুশি। সেযুগের কবি এযুগের এত রকমের 'পদ'-এর কথা ভাবতেও পারেননি, তাই শ্রীরাধার মাত্র দুটি পদের জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের হয়ে ওকালতি করেছিলেন।

আর এযুগে আমরা দেহি-দেহি দাবি তুলে অনেক কিছুই পেয়েচি — পাচ্চিও।

তবু ভরিল না চিত্ত!

কর-কবলিত

কয়েকদিন আগে কর্পোরেশনের ট্যাক্সের নোটিশটা ডাকে এসেচে। নোটিশ পাবার পনেরো দিনের মধ্যে টাকাটা দিলে প্রায় টাকা তিনেক রিবেট বাদ পাওয়া যাবে। এ কম লাভ নয়। তাই ক'দিন ধরে লক্ষ্মীর ভাঁড়ে দু'তিন টাকা করে জমিয়ে শেষে ভাঁড়টা ভেঙে নোট ক'খানা বার করে গুছিয়ে নিলাম। একটু আগে-আগে গিয়ে কর্পোরেশনের কালেকশন ডিপার্টমেণ্টের জানলায় দাঁড়াতে পারলে তাড়াতাড়ি ছুটি। কাজেই সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বেরুলাম।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সরু গলিতে শর্টকাট করতে যাবো, দেখি উপায় নেই। গলির মুখেই একটা বেড়াল মরে পচে আছে। দুর্গন্ধ। কাজেই ঘোরাপথে যাবার জন্যেই ঘুরলাম। রাস্তাটা হিন্দুস্থানী গয়লাদের বৈঠকখানা-কাম-খাবার জায়গা। রাস্তায় খাটিয়া পেতে কেউ ভুঁড়ি বার করে শুয়ে, আবার কেউবা লাঙে বসেচে ঃ পেতলের থালায় বেশ বড় এক ঢেলা ছাতু, সঙ্গে তেঁতুল গোলা, লঙ্কা, নুন। ধামায় ছাতু ভর্তি—পোর্টেবল্ রেষ্টুরেণ্ট। সুতরাং যেন কারোর শোবার ঘরে বা রান্নাঘরে ঢুকেচি জুতো পায়ে—এমনি একটা সংকোচ মনে মনে নিয়ে অতি সন্তর্পণেই এঁকে বেঁকে জায়গাটা পার হওয়া গেল। এসে পড়লাম সদর রাস্তায়।

সদর রাস্তাটা বহুদিন পরে মাত্র কদিন আগে রোড-রোলার চালিয়ে মেরামত হয়েছিলো, সেদিন দেখি এক জায়গায় খোঁড়া হচ্চে। কৌতুহল হলো। কাজ করছিলো যারা, তাদের জিগ্যেস করতেই বললো, সামনা বাড়িমে টেলিফুককা তার জায়েগা। —অ। আরো খানিকটা পথ এগিয়ে যেতেই দেখি, ঐ একই ব্যাপার। সরাসরি জিগ্যেস করলাম, হিঁয়া কেয়া? উত্তর পেলাম, ইলেকটিরিক কা তার জায়েগা। বুঝলাম সব তাঁরই ইচ্ছা।

বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম বাস-ষ্টপে। বাসের দেখা নেই। কিন্তু একখানা ট্যাক্সি আসচে। ট্যাক্সি আমার লক্ষ্য নয় (বিশেষ ক'রে কটা টাকার

রিবেট বাঁচাতে যাচ্ছে যে !) কিন্তু দেখি ট্যাক্সিটা যেন আমাকে লক্ষ্য করেই ছাড়াক ক'রে এক ঝলক কাদা ছিটিয়ে দিয়ে গেল সর্বাঙ্গে। যাঃ! একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে রাস্তায় গর্তে-গর্তে জল জমে ছিল। এখন জামা-কাপড় সব .....!

এমন সময় বাস এসে গেল। যাকগে, এই অবস্থাতেই উঠি। আজকেই টাকা জমা দেবার লাষ্ট ডেট, যেতেই হবে। উঠলাম। অনেকেই আমাকে দেখতে লাগলেন, আমি বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। নামলাম শেষে ধর্মতলা ষ্ট্রীটে।

নেমে গ্র্যাণ্ড ষ্ট্রীট দিয়ে হাঁটছি, একটু তাড়াতাড়িই হাঁটছি—দেখি সামনে একটি ষাঁড়। তার পাশ কাটিয়ে যেতে যাবো —ষাঁড়টা বুঝি আমার সঙ্গে রসিকতা করলো। দোলের দিনে যেমন জামায় একটু রং দেওয়া দেখলে ছেলেরা আরো রং দেয় তেমনিই বুঝি ষাঁড়টি আমার জামা কাপড়ে কাদার বিচিত্র চিত্র দেখে তার গোবর মাখা ল্যাজের এক ঝাপটা মেরে আমার জামায় কলকাত্তাই নাগরিকতার সীল মেরে দিলো। আমি কনফার্মড সিটিজেন অব ক্যালকাটা হলাম।

তবু পেছপা হলাম না। সামনে কর্পোরেশন, অথচ ফেরত যাবো ? কাদা হেরি ক্ষান্ত হবো ট্যাক্স জমা দিতে ? অত হতাশ হলে চলবে কেন ? এগিয়ে গেলাম আরো। ঐ যে লাল বাড়ি। বাড়িটার দিকেই লক্ষ্য ছিল হয়তো, গেটে ঢোকবার মুখে একদম পপাত ধরণী 'পরে। এ হে! ধরুন ধরুন, উঠুন, উঠুন। আমার দু'বগলে হাত দিয়ে টেনে ওঠালেন ক'জন ভদ্রলোক। আমার জুতোর তলায় কলার খোসা তখনো আটকে আছে।

একি ! পা-টা নাড়াতে পারছিনে যে ! যন্ত্রনা হচ্ছে কি ? হলো ! হাড় ভাঙলো নাকি ? দুজন ভদ্রলোকের কাঁধে ভর দিয়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে বললাম, মশায়রা, আমাকে অনুগ্রহ করে কর্পোরেশনের ভিতরে নিয়ে চলুন না ! বললেন তাঁরা, ওখানে কি করবেন ? বরং রিক্সা ডেকে দিই, হাসপাতালে যান—পায়ের হাড়টা --

না, না। আগে ওখানে চলুন—!

কর্পোরেশনের কালেকশন ডিপার্টমেণ্টের কাউণ্টারের কাছে কোনরকমে দুই ভদ্রলোকের কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খাঁড়িয়ে এলাম। পকেট থেকে টাকাগুলো আর নোটকখানা বার করে বললাম ঃ এই যে আমার ট্যাক্সটা নেবেন স্যার।

একটি শিক্ষাপ্রদ সাক্ষাৎকার

এ সে সাক্ষাৎকার নয়।

মানে, কোন ফিল্ম-ষ্টারের সঙ্গে কোন সিনেমা পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নয়। বিশেষ করে কোন স্ত্রীজাতীয়া উঠতি ফিল্ম-ষ্টার হলে তো কথাই নেই। গিয়ে হেসে হেসে চা-টা খাওয়া, ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প করা, তিনি কখন হাসেন কখন কাশেন কখন তার পুষি বেড়ালকে ভালবাসেন-ইত্যাদি সব লিখে নেওয়া এবং তারপর তাঁর নানা পোজে ফটো তোলা ইত্যাদি। এসব তো আর সাক্ষাৎকার নয়, যেন প্রিয়সখীর কাছে কাৎ হওয়া।

আমি যে সাক্ষাৎকারের কথা বলচি তা রীতিমতই সাক্ষাৎকার। শক্ খেয়ে কাৎ হবার অবস্থা।

এক ভি আই-পি বা ভিপ্-এর সঙ্গে আমার মতো ভি-ও-পি বা ভপ বা ভেরি অর্ডিনারী পার্সনের সাক্ষাৎকার। তাও আবার নিজের গরজে! অতএব ভিপ-এর তর্জন গর্জন আশা করে ভপ-এর সাক্ষাৎকার যাত্রা।

এসব সাক্ষাৎকার শর্টকাটে হয় না!

'এই এলাম স্যার' বলে ঢুকলে (অবশ্য সব ব্যূহ ভেদ করে যদি ঢোকা সম্ভবপর হয়) তখনই ভিপ্-এর ভয়ানক মুখের অবস্থা আর চোখের চক্কর এমন হয় যে সঙ্গেসঙ্গে বলতে হয়—আচ্ছা, এই গেলাম স্যার।

না, আমি যথারীতি সাক্ষাৎকারের জন্যে আবেদন পত্র দিয়েছিলাম এবং তার কোন উত্তর না পেয়ে আবার রিমাইণ্ডার দিয়েছিলাম। তাতেও কোনও সাড়া না পেয়ে তখন রি-রিমাইণ্ডার এবং পরে আরো রি-রি-রি-রিমাইণ্ডার দেওয়ায় হয়তো ভিপ্-এর সারা শরীর রি-রি করায় তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি সাক্ষাৎকারের একটা দিন-ক্ষণ জানিয়ে দুলাইনের পত্র দিয়েছিলেন, হ্যাঁ দিয়েছিলেন, মিথ্যে বলবো না।

আমি সেই পরম পত্রখানা শিরোধার্য করে, পরে বুক ঢিপঢিপ বন্ধ করবার জন্যে বুকে ধার্য করে, ঘরের সব দেবতাকে প্রণাম করে, এবং বাইরে পথের ধারে মা মনসা মা শীতলা, ফুটপাথ জুড়ে বাবা নিমগাছ বা বাবা বটগাছ দেবতাকে গড় করতে করতে গুড়িগুড়ি গিয়ে হাজির হলাম ভিপু-এর বাড়ির গেটের সামনে।

গেটের দারোয়ানদের ভিপু সম্বন্ধে দারুণ মাত্রাজ্ঞান। লেটেষ্ট মডেলের গাড়িচড়া কাউকে মিলিটারি স্যালুট, পুরোন মডেল-ওলাকে সিভিল সেলাম, স্যুটেড বুটেড কাউকে আধা সেলাম, আর আমার মত ধুতি পাঞ্জাবী পরাকে স্রেফ চ্যালেঞ্জ —কেয়া মাংতা ?

আমার বুক পকেটে রাখা পাশপোর্টখানা দেখিয়ে বললাম– সাব কো সাত ভেট···

গেটের ভেতরে ঢোকবার অনুমতি পেলাম এবং লেট না হলেও বারান্দায় বা এদিক ওদিক কারোরই ভেট পেলাম না। চিঠিখানা একবার বার করে দেখলাম, না, ডেট তো ঠিকই আছে, টাইমও ঠিক।

এদিক ওদিক দেখছি, যদি কাউকে দেখতে পাই, এমন সময় একজন বেয়ারা সদর দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে তার মুন্ডুটা বার করে বললো—কাকে চাই ? সাব-কে ? তিনি বেইরে গেছেন। মানে, গেট আউট। আজ একটা অয়েল ফ্রাই রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন উৎসব আছে।

কী আছে ?

বললাম তো অয়েল ফ্রাই রেস্টুরেন্ট—ইংরিজি জানেন না ? তেলেভাজার দোকানের শুভ উদ্বোধন !

বলেই দরজা বন্ধ করে দিলো। ওরাও তো চিপু-ভিপ, বেশি কথা বলে না।

তবে দেখলাম, দরজাটা ফাঁক পেয়ে ভিপু-এর অ্যালসেসিয়ান কুকুরটা বেরিয়ে এলো বাইরে। বুঝি আমাকে সান্ত্বনা দিতে।

ভাবছিলাম কী করবো ? চলে যাবো, না, ভিপু-এর জন্যে অপেক্ষা করবো। গেট দিয়ে একবার গেট আউট হলে আর গেটে ইন করা যাবে কিনা সন্দেহ। আচ্ছা, দারোয়ানটা তো বললে না, ভিপু বাইরে গেছেন।

এই সব ভাবছি, হঠাৎ কানে এলো কে যেন ডাকছে শোনো।

কে ?

পেছন ফিরে দেখি ভিপের অ্যালসেসিয়ান কুকুরটা আমার দিকে চেয়ে আছে। ভাবটা, কী ভাবচো?

কেন যেন কুকুরটাকেই উদ্দেশ্য করে বললাম, কে ডাকলো আমাকে?

আমি।

আশ্চর্য, কুকুরটা দিব্যি মানুষের মতই বললো, এদিকে এসো গ্যারেজের পেছনে।

তুমি কুকুর, কথা বলচো?

হ্যাঁ বলচি। কুকুরটা বললো, এসো আমার সঙ্গে, আরো কথা বলবো।

কুকুরের পেছন পেছন গিয়ে নির্জন গ্যারেজের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কুকুরটা তার পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে বসে তার ডান পা-টা উঁচিয়ে উপদেশ দেবার ভঙ্গীতে বললো, এত আশ্চর্য হচ্চো কেন আমায় কথা বলতে শুনে? মানুষেরা যদি কুকুরের মত ব্যবহার করতে পারে, এমন কি হাঁকডাক করতে পারে —এই যেমন ভয় পেলে কেঁউ কেঁউ করে, রেগে গেলে ঘেউ ঘেউ করে — আর আমরা কুকুররা মানুষের মত কথা বললেই হাঁ হয়ে যাবার কী আছে?

না, এই বলছিলাম ---

কী আবার বলবে? কেন এশপস্ ফেব্‌লে পড়োনি জন্তু-জানোয়াররা কথা বলচে, কুকুররা কথা বলচে --এসব কী মিথ্যে ভাবো? বিষ্ণুশর্মার গল্পেও তো পশু পাখিরা কত কথা বলেচে।···যাক্ এখানে যে জন্যে আসা আমি জানি।

জানো?

হ্যাঁ তুমি তো একজন লেখক? রঙ্গব্যঙ্গের গল্প, নাকি কবিতা লেখো। লোকের পেছনে লাগো। অতএব বলে রাখি তোমার দ্বারা কিসসু হবে না। তুমিই তোমার নিজের পায়ে কুড়ুল মারচো।

মানে—

মানে আর তুমি আমাকে কী বোঝাবে! তুমি সাহিত্য কীভাবে লিখতে হয় জানো হয়তো, কিন্তু কিভাবে কাকে ধরতে হয়, কোথায় কী করতে হয় এসব মোটেই জানো না। দাঁড়াও, তুমি আমার কাছে বকুনি খাবার আগে কিছু খাও—

বলেই কুকুরটা কাছেই একটা প্লেটে রাখা দুখানা বিস্কুট মুখে করে এনে আমার হাতে দিয়ে বললো, খাও, ভালো ডগ-বিস্কুট। বাজে জিনিস নয়, দামী।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতে হলো। খেতেও হলো।

কুকুরটা তেমনই আগেকার ভঙ্গীতে বসে ডান পা নেড়ে বলতে লাগলো— মুস্কিল হয়েছে কী জানো? এই তোমাদের একটা মতামত আছে আর সেটা প্রকাশ করতেও ছাড়ো না। এই দেখোনা, আমার কোন নিজস্ব মতামত নেই, আমি তোমার মত গল্প কবিতা লিখিনে, কাগজের সম্পাদকীয় লিখে বাহাদুরী দেখাইনে, অথচ কেমন বহাল তবিয়েতে আছি।

বললাম. তা তো দেখচি।

কুকুরটা বলতে লাগলো, দেখো, এই যে তুমি এসেচো আমার কর্তার কাছে তোমার অভাব অভিযোগ নিয়ে তার প্রতিকারের আশায়, কিন্তু কিস্সু হবে না। উনি ঘাড় নাড়বেন, আশ্বাস দেবেন কিন্তু কিছুই করবেন না। জীবনে যদি উন্নতি করতে চাও, তোমার নিজস্ব মতামত ভুলে যাও। শেখো সব কিছুতেই হেঁহেঁ আর হুঁহুঁ করতে। আজকের দিনে ঐটাই হচ্চে কোয়ালিফিকেশান, পেটের বিদ্যে নয়। আমার পেটে বিদ্যে আছে? কিন্তু আমার এই রাজার হাল কেন? আমি কর্তার পা-চাটি, তাকে দেখলেই ল্যাজ নাড়ি।···ও তোমার আবার ল্যাজ নেই—

বলেই একটু থেমে বলতে লাগলো, ল্যাজ না থাক ঘাড় তো আছে? ঘাড় নাড়বে। কর্তার কথায় ঘাড় নাড়বে। অনেকের টাইটেলের ল্যাজুড় থাকে, ভাবে সে মস্ত একটা কেউকেটা। ভূল করে। তুমিই দেখো, ঐ দুটো প্যাঁচে আমি কেমন মজাসে আছি! অন্য জানোয়াররা গাড়ি টানে. লাঙ্গল টানে, বোঝা বয় বোকার মতো। আর আমি? মোটরে চড়ি, সোফায় বসি, গদিতে ঘুমোই। সাবান মাখাবার জন্যে, সময়মত খাওয়াবার জন্যে, আমাকে নিয়ে বেড়াবার জন্যে, আমার বড়-বাইরে করাবার জন্যে চাকরও আছে। তাছাড়া আমার জন্যে আলাদা মাংস আনা, আলাদা রান্নার ব্যবস্থা কেন? না, ল্যাজ নাড়ি, আমার নিজস্ব কোন মতামত নেই। বুঝলে?

বুঝলাম। সত্যিই, কুকুরের কথাগুলো আমার মনেপ্রাণে রীতিমত দাগ কাটলো। আমার মনে হলো, ওতো কুকুর নয় সাক্ষাৎ কোন অবতার। মহাভারতের সেই কুকুরবেশী ধর্ম নন তো? কলিকালের ধর্মের কথা শোনাচ্চেন আমাকে?

তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসলাম আমি। বললাম, হে মহাভাগ, হে চতুষ্পদী অবতার, আপনাকে প্রণাম করি। আপনার ঐ চতুষ্পদ

আসলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। আপনার হেঁ হেঁ আর হুঁ হুঁ মন্তরেই আমি আজ থেকে দীক্ষিত হলাম। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

এমন সময় পিঁ-পিঁ শব্দ হলো।

এসো, ঐ যে কর্তা আসচেন।

কুকুরটা ছুটে চলে গেল। আমি আড়াল থেকে বাইরে এসে দেখি বাড়ীর চারধার থেকে বেয়ারা চাপরাশী ছুটে বেরিয়ে এসেচে। গেট দিয়ে ঢুকচে একটা বিরাট মোটর গাড়ি। গাড়িটা থামতেই বেরিয়ে এলেন ভিপ্। তাঁর গলা বুক মালায় ঢাকা।

আর কুকুরটা ছুটে গিয়ে তাঁর পা শুঁকলো একবার, তারপরেই ল্যাজ নাড়তে নাড়তে পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভিপ্-এর পেটে মাথাটা ঘসতে লাগলো, ভিপ্ হেসে একটু নিচু হয়ে তাকে আদর করতেই সে ভিপ-এর বাঁ গালটা চেটে দিলো একবার।

কুকুর-অবতার যেন হাতে কলমে দেখিয়ে দিলো কি করতে হয়, কি ভাবে করতে হয়।

দেখলাম। বুঝলাম, কারোর পা চাটতে পারলে তার গাল চাটাও যায়। দেখলাম ল্যাজ নাড়তে পারলে অনেক কিছুই হয়।

কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। হতভম্ব হয়ে দেখলাম শুধু। ভিপ্ তাঁর সঙ্গে আসা আরো দুজন মোসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কুকুরটাকে আদর করতে করতে আমার সামনে দিয়েই বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলেন না।

সব দেখলাম এবং বুঝলাম, আমার দ্বারা কিসসু হবে না।

জনতা

জনতাকে সহজে চেনা যায় না।

জনতার মুখ অস্পষ্ট, আবছা। জনতার মুখ রোজ দেখা যায়, কিন্তু মনে রাখা যায় না। জনতা প্রায়ই সচল। নিয়ম-মাফিক চলে, ভয় পেলে ছত্রাকার হয়ে পালায়। আবার দরকার হলে পুলিসের লাঠি বা গুলির সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়। জনতা কখনো স্থির, কখনো অস্থির। কখনো শান্ত, কখনো দুর্দান্ত।

জনতা একটা মস্ত বড় গোষ্ঠি। অথচ কেউ কাউকে চেনে না, জানে না। পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি চলচে, অথচ কেউ কারোর পরিচয় জানে না, জিজ্ঞাসাও করে না। কিন্তু একসঙ্গে কাজ করে যায়, একই লক্ষ্য।

জনতা একসঙ্গে মিছিল করচে, বক্তৃতার মঞ্চের সামনে জড়ো হচ্চে, একসঙ্গে চিৎকার করচে, কোথাও কিছু হলে জড়ো হয়ে দেখচে, কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করচে, কাউকে দরকার মত পিটচে, রেগে গেলে ট্রামে বাসে আগুন ধরাচ্চে, আবার দু'বেলা শান্ত শিষ্ট হয়ে দলে দলে অফিসে যাচ্চে আর বিকেলে বাড়ি ফিরচে।

জনতার জোর রীতিমতো জোরালো। কথায় আছে—মানুষ একা না বোকা। কিন্তু সেই মানুষ যখন জনতার ভিড়ে মেশে, তখন সে রীতিমত রোখা, শক্তিশালী। সেই গল্পের মত। কৃষক তার মৃত্যুশয্যায় ছেলেদের ডেকে আনিয়ে একটা কাঠি দিয়ে বললো. 'ভাঙো'। সেটা সহজেই এক ছেলে ভেঙে ফেললো। পরে একগোছা কাঠির বাণ্ডিল দিয়ে বললো 'ভাঙো এই বাণ্ডিল।' চেষ্টা করে কোন ছেলেই পারলো না। তখন কৃষক উপদেশ দিলো—'তোমরা যদি এমন একসঙ্গে থাকো, কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।' জনতার ব্যাপারেও ঠিক তেমনই।

ইতিহাসে অনেকবার দেখা গেচে, জনতা শুধু লাঠি-সোটা নিয়েই বন্দুক-ধারী দুর্ধর্ষ সৈন্যদের হটিয়ে, অত্যাচারী রাজা বা শাসককে গদি থেকে টেনে নামিয়েচে। আবার পরে নিজেদের কাজে লেগেচে।

আশ্চর্য, জনতার নিজস্ব কোন ডেরা নেই, দপ্তর নেই, নিয়মকানুন নেই। প্রেসিডেণ্ট, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী, ট্রেজারার নেই। নেই মালা পরবার বা পরাবার ঝামেলা। শুধু আছে একসঙ্গে একজোটে কাজ করার ক্ষমতা, একই লক্ষ্যে এগোবার প্রেরণা। এবং যেই কাজটা শেষ হয়ে গেল, অমনি জনতা ভেঙে গেল, সবাই চলে গেল যে-যার কাজে। জনতা তখন জনৈক মাত্র।

অথচ প্রত্যেক জনের বা জনৈকের নিজের ঘর আছে, সংসার আছে, স্ত্রী পুত্র কন্যা আছে এবং তাদের দেখবার ভার ঐ জনৈকের উপরেই। ঐ জনৈক সেখানে রীতিমত হিসেবী, সাবধানী। তার জনতা গোষ্ঠীর মত বেপরোয়া নয়। বরং জনৈক তখন ঐ জনতাকেই ভয় করে।

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।'—কবির এই বাণী, জনতা বিশ্বাস করে না। জনতা জানে, জনতার ডাক শুনে কেউ না কেউ আসবেই, জমবেও। আর একসঙ্গে সবাই পা ফেলে চলবে বুক ফুলিয়েই। চল্ চল্ চল্। জনৈক গনেশ ওলটায়, জনগণ রাজ্য ওলটায়।

জনৈক ট্রামে বাসে ট্রেনে চড়বার সময় টিকিট কাটে, না কাটলে ফাইন দেয়। অথচ ঐ জনৈকই যখন জনতায় মেশে, তখন টিকিট কাটবার তার আর বালাই থাকে না। টিকিট চেকারও তখন জনতার ধারে-কাছে থাকে না বা যায় না। বরং দেখা যায়, মুষ্টিমেয় পুলিশ ভ্যানের খাঁচার মধ্যে থেকে জনতার লেজুড় হয়ে চলতে থাকে।

জনতা যখন ক্ষিপ্ত হয়, তখন যেন একপাল ক্ষেপা কুকুর। আর জনতা যখন শান্ত অথচ মিছিলে সচল, তখন যেন সুদৃঢ় সুগম্ভীর চলন্ত হিমালয় পর্বত। যেন একটি মানুষের অজগর এবং রীতিমত জাগ্রত!

জনতা যেমন দেশকে ধ্বংস করতে পারে, তেমনি দেশকে সমৃদ্ধ করবার ক্ষমতা তারই উপর। জনতা ছাড়া নেতারা অসহায়, পঙ্গু। আরও দেখা যায়, জনৈক নেতাদের করে তোয়াজ, আবার নেতারা তোয়াজ করেন জনতাকে। তাই নেতাদের মূল কথাই হচ্চে 'আমরা জনগণের সেবক। জনগণই আমাদের আদালত ইত্যাদি।'

কারণ জনতাই দেশের জান্ বা প্রাণ।

পেরাইজ ঃ দিল্লীকা লাড্ডু—বাংলার নাড়ু

মনে লোভ থাকলে শান্তি থাকতে পারে না।

মনের পক্ষে ঐ দুটোকে নিয়ে সংসার করা খুবই শক্ত। মন কেবলই ছোঁক-ছোঁক করতে থাকে ঃ এটা চাই, ওটা চাই, আর না পেলেই দুঃখু। মনে অশান্তি।

সব জানি। তবু আমাদের মন মানে না। লোভের টোপ খাবার জন্যে মন হাঁ হয়েই থাকে। ব্যবসায়ীরা লাভের, না, অতি-লাভের লোভে ঘুরচে, রাজনীতিকরা গদীর লোভে ঘুরচে এবং কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা ঘুরচে যশের লোভে আর সেই সঙ্গে রৌপ্যরসের লোভে!

তথা প্রাইজের লোভে!

কিন্তু প্রাইজ এখন হয়েচে পেরাইজ। দিল্লীকা লাড্ডু। বাঙ্গালীর নাড়ু। হাত ঘোরালেই নাকি নাড়ু পাওয়া যায়। তাই নাড়ুর জন্যে গোপালরা হাতড়ে বেড়াচ্চে চারধারে আর হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলচে ঃ কোথায় নাড়ু, কোথায় নাড়ু!

আহা, সেই ছোট্টবেলাকার কথা আজও মনে পড়ে ঃ স্কুলে প্রাইজ পেয়ে ছুটে বাড়ি এসে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা জড়িয়ে জানানো ঃ মা, মা, আমি পেরাইজ পেয়েচি।

সে প্রাইজ পাওয়ার আনন্দ ছিল, উৎসাহ ছিল এবং প্রাইজগুলোও হয়তো বিশুদ্ধই ছিল। আর ভেজাল থাকলেও মনে হয়, দু-পাঁচ পারসেন্ট। হেডমাস্টার মশায়ের ছেলে গোপলা স্রেফ হেডমাস্টার মশায়ের ছেলে বলেই সেকেণ্ড না হয়ে ফাস্ট' হতো বা বেশি দামের বই পেতো। কিন্তু তখনকার ছোট্ট মনে অত 'ছোটকথা' ঠাঁই পেতো না। পেরাইজ পাওয়ার গৌরবেই তখন গরবী আমি, বিভোর আমি।

হায়, সেদিন আর নেই। সেই বিশুদ্ধ ঘি-দুধ-তেল-চাল-আটা-ময়দার যুগে যেখানে যে সামান্য প্রাইজটুকু দেওয়া হতো, তা প্রায় বিশুদ্ধই পাওয়া যেতো।

কিন্তু সেই সোনার খাঁচার দিনগুলি মোর রইল না। 'মোর' নয়--মোদের। আমরা এখন ভেজাল পেরাইজের মোহে আচ্ছন্ন। ঘি-য়ে যেমন বনস্পতি, দুধে যেমন জল, তেল-এ কেমিক্যাল, চালে কাঁকর, আটা-ময়দায় তেঁতুল-বীচি—ঠিক তেমনিই আজকের প্রাইজের মধ্যে দেখা দিয়েচে অভিনব ভেজাল ঃ ধরাধরি। প্রাইজ আবার সেই 'পেরাইজ'-ই হয়েচে—ব্যঙ্গার্থে! খাদ্যের ভেজালে দেহ আমাদের রুগ্ন, ভেজাল পেরাইজের কল্যাণে মন আমাদের অসুস্থ, নেশাগ্রস্থ! আমরা নেশায় বুঁদ হয়ে, মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে নীচু করে দুর্বল পায়ে ছুটে মরচি পেরাইজ-রূপী রঙীন প্রজাপতির পেছনে পেছনে। মানুষের জীবনে অতি প্রয়োজনীয় প্রাইজ, প্রেইজওয়ার্দি না হয়ে এমন পংকিল হতে পারে, তা আগে কে জানতো!

এই পেরাইজের জাল এখন সর্বত্রই বিস্তারিত। আমাদের চারিদিকে এখন পেরাইজের জাল। এক টাকার স্টেট-লটারী রূপে, শিশুখাদ্যে বা সাবান, কফি ইত্যাদিতে ধাঁধার রূপে। নাচে গানে, শিল্পে, সাহিত্যে, কৃষিকর্মে এবং বহু-কর্মেই জড়িয়ে আছে পেরাইজের জাল। পশ্চিমবঙ্গে এই বস্তুই 'নাড়ু' রূপে বিরাজিত, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পীঠস্থানে ইনিই 'দিল্লীকা লাড্ডু'। এই নাড়ু বা লাড্ডুর ভিতরে ভেজাল থাকলেও বহিরঙ্গ রূপোর রাঙতায় মোড়া। অতএব লোভনীয়। কাজেই একটু হাত ঘোরালেই যদি নাড়ু পাওয়া যায়, একটু হেঁ-হেঁ করলেই হাঁয়ের মধ্যে লাড্ডু এসে পড়ে যদি, তবে কোন মূর্খ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে বা মুখ বুজে উপরিস্থিত পরম করুণাময়ের ধ্যান করবে? তাই তো দেখি, অধিকাংশ শিল্পী ও সাহিত্যিকের দৃষ্টি এখন মহৎ সৃষ্টির দিকে নয়, 'সুমহান' নাড়ু বা লাড্ডুর দিকে।

ঐ নাড়ু ও লাড্ডুর মহাপ্রভুদের দরবারে শিল্পী সাহিত্যিককুলের আকুল আবেদন, পিটিশন। কোর্টে সামলা গায়ে যে সব উকিল মামলায় ওকালতি করেন, তাঁদের আমরা চিনতে পারি। এ দরবারে সবাই অদৃশ্য উকিল, নিজের নিজের পক্ষে। এখানে তাই ওকালতনামা নেই, সাক্ষীর দরকার নেই, শুধু কানে তুলো আর পিঠে কুলো বেঁধে জুরি মহোদয়ের কাছে সুকৌশলে ঝুড়ি-ঝুড়ি আত্মপ্রশংসা পেশ করতে হয় ঃ হুজুরগণ, এ ব্যাপারে ওরা

চুনোপুঁটি, আমিই রুই-মৎস্য ! অতএব আমাকেই—হেঁ হেঁ হেঁ ! এ ছাড়া আর কি কি করতে হয়, এ অধমের তা জানা নেই ।

এই কর্ম্মটি (অপকর্ম্ম না-ই বললাম) যিনি যেন-তেন-প্রকারেণ করতে পারবেন, এই অ-মূল্য অথচ মূল্যবান দ্রব্যটি তাঁর হস্তগত হবেই । ভেজাল যুগে জালে পেরাইজ-মাছ ধরবার আর কোন পথ নেই । ন অন্য পন্থাঃ

উপায় কি ! এখন গুণীদের কেউ খুঁজে বার করে না, তাই গুণীকেই ঘরের বাইরে এসে গুণ্ গুণ্ করে শোনাতে হয় নিজের প্রশংসা । অবশ্য পেরাইজের জাতে ওঠবার জন্যে ।

আমরা এই নাড়ু আর লাড্ডু-দাতাদের তোগলকী কাণ্ডকারখানা দেখে ধিক্কার দিলেও, আর বিস্মিত হইনে । যোগ্যপাত্রে দান করবার যে যোগ্যতাটুকু থাকা দরকার, তাই যখন তাঁদের মধ্যে অভাব, তখন ন্যায় কিছু আশা করাই অন্যায় । তাই অজ্ঞ-দাতার নির্বাচিত অপদার্থ গ্রহীতাকেই প্রায় দেখতে পাই আমরা । অবশ্য সব ক্ষেত্রে তা নয়, এই যা রক্ষে ।

তা হলে পেরাইজ পেলেই কী মোক্ষ লাভ ? না । পাঠকরা শ্রোতারা দর্শকরাই প্রাইজ দেবার আসল মালিক । কাজেই তাঁরা যখন দেখেন, অযোগ্য একজন গলায় পেরাইজের মালা দুলিয়ে বুক ফুলিয়ে একটা উঁচু আসনে বসে আছে, তখন তাঁরা মুচকে-মুচকে হাসেন, মুখে কিছু বলেন না । আহা, বেচারী যদি মনে কষ্ট পায় !

দ্বাপর যুগে এই কলিযুগের মত পেরাইজ দেবার রীতি ছিল না । ছিল না আকাদামী প্রাইজ, রবীন্দ্র পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার—আরো নানারকমের পিঠচাপড়ানি পুরস্কার ! তাই সে যুগের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মশায় তাঁর 'গীতা' খানির জন্যে কোনরকম প্রাইজই পাননি । তাতে কি ? তাঁর রচিত 'গীতা' দেখি আমাদের ঘরে ঘরে । আজও যুগযুগ ধরে বইখানি সসম্মানে সমাদৃত, বহু ভাষায় অনূদিত, বহুভাবে আলোচিত, অগণিত সংস্করণে প্রকাশিত । এবং এই জ্ঞানগর্ভ ছোট্ট বইখানি যেন আজ বড় গলায় বলচে ঃ ওহে যশোলোভি, তোমার মধ্যে যদি 'সার' না থাকে, তবে হাজার রকম পেরাইজেও তোমাকে পিঁজরাপোল থেকে বাইরে রাখতে পারবে না ।

এই সব প্রাইজ তো কালিদাস, সেক্সপীয়র, এ যুগের মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্ররাও পাননি, তবু মান খোয়া যায়নি, তাঁদের বইও উইয়ে খায়নি ।

কিন্তু আমরা বুঝি কই ? কিংবা বুঝেও বুঝিনে । জানি, এমনতর

'হরির লুটে' করিতকর্মাদেরই হুড়োহুড়ি। বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞেরা সেখানে স্বভাবতই অনুপস্থিত। কারণ, এ পাওয়ায় আনন্দ নেই, আছে অবসাদ। সুখ নেই, আছে শংকা। কোন নৈতিক মূল্য নেই, অথচ তার মালিন্য আজ সর্বজনবিদিত।

তবু এর রৌপ্যমূল্য? অর্থ-সর্বস্ব সংসারে এ মূল্য অস্বীকার করি কেমন করে? একশো, দুশো, পাঁচশো নয়, বেশ কয়েক হাজারের ব্যাপার। কাজেই তা হস্তগত না হলে মন তো ব্যাজার হবেই। তাই তো আজ স্রষ্টার মন সৃষ্টি ছাড়া, ছন্নছাড়া, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঢেউয়ের ধাক্কায় ধিকৃত, বিকৃত।

সত্যিকারের পুরস্কার শিল্প-সাহিত্যের বা যে কোন সৎকর্মেরই উৎসাহ বর্ধক। সমাজ সাহিত্য ও শিল্পী জীবনের স্বাস্থ্যকর সালসা। সে ক্ষেত্রে অর্থমূল্যই বড় নয়, একটি আন্তরিক পুষ্পমাল্যই যথেষ্ট।

সেদিন এক বন্ধু বললো, তুই কোন প্রাইজ পাসনি, তাই এত কথা।

হেসে বললাম, তবে শোন্ আমার কথা। কোনো প্রাইজ পাইনি বলে আমি এখনও ঐ মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের সমপর্যায়ে আছি। বুঝলি?

বাঁকা চোখে ফুটবল

লোকে যে কেন ফুটবল খেলে আর সেই খেলা লোকে পয়সা নষ্ট করে, সময় নষ্ট করে, শরীর পাত করে দেখতে যায়, তা আজও পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।

একটা চামড়ার গোল বলকে নিয়ে বাইশজনে মিলে লাথা-লাথি করায় লাভটা কি? যদি লাথাতেই হয়, তবে পাজি-বদমায়েস কাউকে বার করে এনে আচ্ছা করে লাথাও না কেন? তাতে বরং দেশের উপকার হবে।

তারপর ঐ যে দু'জন লোক বাঁশি হাতে মাঠের দুপাশে ছুটোছুটি করে দেখচে বল-লাথানোটা ঠিক হচ্চে কিনা, আরে বাপু, লাথি—লাথিই। ক'ষে মারাটা নিয়েই কথা! লাথি-মারা কি অংক কষে হয়?

তাছাড়া ঠেলাঠেলি করে একজনের কাছে থেকে বলটা না হয় নিলাম, তাও নাকি নিজের কাছে খানিকক্ষণের জন্যেও রাখতে পারবো না! একটু রাখতে গেলেই চারধার থেকে চীৎকার! সেটা নাকি আর একজনকে পাস করে দিতে হবে! কেন? এই যে আমি লোকের বাড়ি গিয়ে বইটা-পত্রিকাটা চেয়ে আনি, অফিস থেকে কাগজ-পেন্সিলটা হাতড়ে আনি— গিন্নীকে লুকিয়ে পয়সা জমাই, সে সব কাছে রাখিনে? অবশ্য ম'রে গেলে ছেলে-মেয়ে-বৌ বা অন্য কেউ সেসব পাক ক্ষতি নেই কিন্তু পাওয়ামাত্র হাতছাড়া করতে হবে এমন কি কথা? যদি ভোগেই না লাগলো তবে অত খেটে লাভটা কি।

হ্যাঁ, তারপর ঐ যে দু'টো দুদিকের ঐ 'গোল' নিয়েই তো যত গোল। 'চৌকো' মত গেটের ঐ 'গোল' আগলাবার জন্যে 'গোলকিপার' না-কি, প্রায়ই তো দেখি হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে। আহা, পেটেও তো লাগতে পারে! (আর, আজকাল মেয়েরা যেমন সব কিছুতেই পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলচে তেমনি একদিন যখন এই ফুটবল খেলাও খেলবে, তখন? 'গোলকিপারিনী' যদি গর্ভবতী থাকেন, তা হলে ঐভাবে পড়ে গেলে তো সঙ্গে সঙ্গে…)! না মশাই, আমি তো মোটেই বুঝতে পারিনে—ক্লাবের সভ্যেরা কেন চাঁদা তুলে ঐ

গেটমার্কা 'গোল' দুটোয় পাল্লা ঝুলিয়ে বন্ধ করে দেয় না। না হয় অল্প খরচায় জাল দিয়েও তো আটকে দিতে পারে।

আর, ঐ ছাই খেলবার (?) জন্যে এগারো জন কেন? বারো জন নয় কেন? বেশ এক ডজন হতো তাহলে। যেমন এক ডজন কলা। শুনি, এই সব খেলাও নাকি এক রকমের 'কলাবিদ্যা'। তা যদি হয়, তবে ডজন হিসাবেই হওয়া দরকার। আর সকলে মিলে যখন ব্যাপারটা হচ্ছে তখন তো এটা বারোয়ারী ব্যাপার—যা আসলে 'বারো-ইয়ারী'। অতএব বারো জন হবে না কেন?

আর দর্শকদেরও বলিহারী। ঐ খেলোয়াড়রা খেলচে খেলুক না। তা দেখবার জন্যে তোমাদের অত ছুটোছুটি কেন? বাড়ীতে বসে একটু গল্প-গুজব করো, বাচ্চাদের রাখো, গিন্নীর কাজে একটু সাহায্য করো, নাতি-নাতনীদের নিয়ে নাচাও—তা নয়, মাঠে গিয়ে গলা ফাটানো, ছাতা ওড়ানো, জুতো ছুড়ানো। যত্তো সব! আর টাকা কি কামড়াচ্চে? তাহলে এদিকে কিছু ছাড়লেই তো হয়? অন্তত পুজোয় বেশী করে চাঁদা দিয়ে দাও। আর না হয়, ঐ টাকা দিয়ে গিন্নীর পান-জর্দার ব্যবস্থা করো, দেখবে কেমন তাঁর মুখে হাসি। সংসারে অপার শান্তি।

আসলে আমি ভেবে দেখলাম, এই ফুটবল খেলার আইন-কানুন বদলে ফেলা দরকার। ইংরেজের এই খেলা 'বেঙ্গলী' ক'রে ফেলতে হবে।

একটা ফুটবল নিয়ে হৈ হৈ করা, মারামারি করা চলবে না। যে বল পাবে, সে-ই সেটা নিয়ে সোজা 'হাওয়া' হয়ে যাবে। আবার বল সাপ্লাই করতে হবে।

গোল-এ জাল লাগাতে হবে।

দর্শকদের টিকেট লাগবে না। এবং তারাও ইচ্ছে করলে মাঠে নাচন-কোদন করতে পারবে। রাগ হলে খেলোয়াড়দের পেটাতেও পারবে। অবশ্য যাকে ভালো লাগবে তাকে সন্দেশ খাওয়াতেও হবে।

শীল্ড পেলেও নাকি আবার তা ফেরত দিতে হয়। তা কেন? শীল্ডটাকে ঝেড়ে দিয়ে সেই পয়সায় রুটি মাংসের ফিষ্টি হবে। লোকে মেডেল বা কাপ পেলে আবার ফেরত দেয় নাকি?

অর্থাৎ ফুটবল খেলায় বর্তমানের বুজরুকী চলবে না।

দশের দাবী মানতে হবে, নইলে খেলা বন্ধ হবে।

ব্যাডমিণ্টন ঃ বাঁকা চোখে

আমার মতে, ব্যাডমিনটন খেলার মত অমন খারাপ বা ব্যাড খেলা আর নেই।

শুধু কি ব্যাড, একটা বেরসিক খেলা।

আচ্ছা তুমিই বলো, তোমাকে কেউ ভালবেসে একটি ফুটন্ত সাদা গন্ধরাজ বা একটি পাঁপড়ি মেলা শ্বেতপদ্ম তোমার হাতে তুলে দিলো, আর তুমি কি করলে? সেটাকে মোলায়েম হাতে তুলে নিয়ে তার বোঁটাটি ধরে নাকের সামনে দোলাবার বা তার রূপ সৌন্দর্য দেখবার কথা খেয়ালেই আনলে না—যেমন দেখেচো ইতিহাসের বইয়ের পাতায় ফুল হাতে প্রেমিক রসিক বাদশা শাজাহানের ছবি! তুমি করলে কি, একটা ছোট তক্তা দিয়ে ফুলটাকে পেটাতে থাকলে! পিটিয়ে পিটিয়ে তার পাঁপড়িগুলোকে ঝরিয়ে দিলে। যেন মুরগীর পালক ছাড়ালে। যেন শান্তশিষ্ট ভরাযৌবনা রূপসী বৌকে ঘরে এনে তাকে খাটিয়ে খাটিয়ে আর লাথিয়ে ঝেঁটিয়ে পিটিয়ে তার হাড়মাস কালি করে দিলে!

ঐ ব্যাডমিনটন খেলাও হচ্চে তাই-ই।

অমন সুন্দর একটি হাল্কা মেজাজী তুষারশুভ্র পালক-ফুলটাকে নিয়ে কেবল এধার ওধার করে পেটানো।

কেন রে বাবা! কী দোষটা করলো ঐ অবোধ অসহায় ফুলটা। ওকে তোমার ভালো না লাগে, বেশ তো, ওকে তোমাদের কাছে ঘেঁসতে না দিলেই হয়। তা নয়, পয়সা দিয়ে ওকে কিনে নিয়ে আসবে, আর এনে মাঠে পাঁচজনের সামনে ওকে দুজনে বা চারজনে ধাঁই ধাঁই করে পেটাবে! কী অন্যায়! সত্যিই যদি হাতের সুখ করবার জন্যে পেটাতেই হয়, তবে ঘরে বসে পেটাও —

যেমন লোকে বৌকে পেটায়, ছেলেকে পেটায়—তা নয়, বাইরের পাঁচজনের সামনে তোমার বীরত্বটুকু না দেখালেই নয় ?

আবার শ্বনেচি ঐভাবে মারের বীরত্ব দেখাতে পারলে নাকি পেরাইজ পাওয়াও যায় ! ঝাড়্ব মারো অমন পেরাইজে । একটি গোবেচারিকে ঠেঙিয়ে পেরাইজ ! আবার নাকি ঠিকমতো গোবেচারাকে পেটানো হচ্চে কিনা দেখবার জন্য আম্পায়ার না ভাম্পায়ার কে যেন সামনে বসে থাকে । ছি-ছি, কী ঘেন্নার কথা !

যাক, এতো গেল ফুল নিয়ে fool দের কান্ড !

তাছাড়া এই ব্যাডমিণ্টন খেলাটা কী রকম অভদ্র খেলা সেটা কেউ ভেবে দেখেচো ? ধরো কেউ যদি তোমার দিকে একটা ফুল ছ্বঁড়ে দেয় -- বিশেষ করে কোন মেয়ে—তুমি কি উজব্বকের মত ফুলটাকে থাবড়া মেরে ফেলে দেবে, না ল্বফে নেবে ? আরে বাবা, হঠাৎ তোমার দিকে ফুল ছোঁড়াটার মানেটা কি ?-- প্রেমের ইশারা ! প্রেমের খেলা । অথচ ঐ তোমাদের ব্যাডমিনটন খেলায় দেখেচি—ওই যে তোমরা কী বলো মিক্সড ডবল নাকি, তাতে তো এপারের মেয়েটি ওপারের ছেলেটাকে পালক-ফ্বলটা ছ্বঁড়ে দেবামাত্র পত্রপাঠ সেটা ব্যাটের থাবড়ায় ফেরত পাঠিয়ে দেয় । কী আহাম্মোক ! অথচ আমি জোর গলায় বলতে পারি ওই খেলার মিক্সড-ডবলই ফ্বল ছোঁড়াছ্বঁড়ি করে পরে ফিক্সড ডবল হয়ে সংসার পাততে পারে ।

আর যদি কোন প্বর্বষমান্বষই তোমাকে একটা ফ্বল দেয়, তুমি কি সেটা পত্রপাঠ ধাক্কা মেরে ফেরত পাঠাবে ? তাকে তো বলে অভদ্রতা । ঐ ব্যাডমিনটন খেলায় ঐ অভদ্রতা চলে হরদম ! আর যে যত ঐ ভাবে অভদ্রতা করতে পারে সেই পায় হাততালি ।

হ্যাঁ শ্বনেচি ব্যাডমিনটন খেলার ঐ ব্যাটগ্বলোর নাকি বেশ দাম । পেটাবার জিনিসটা দামী হলে পেটাতে খ্বব স্বখ হয় ব্বঝি ? নইলে বাঁশের শ্বর্ব বাখারি ঐভাবে গোল করে ঘ্বরিয়ে তাতে স্বতুলি দড়ি ব্বনে নিলে ব্বঝি হয় না ? আসলে পয়সার গরম দেখানো ।

তারপর ঐ জাল বা নেট ! ও জাল তো স্রেফ ভেজাল । না ওটা মাছ ধরবার জাল, না ওটা নেটের মশারির নেট ! তবে কী ওটা ? দ্ব'পক্ষের কোর্ট দশের দ্'নের মাঝখানের পার্টিসান ? বেশ তাই-ই যদি হয় তবে মেমসাহেবদের স্কার্টের মত ঐ নেট ঝুলিয়ে লাভটা কি ? ওর তলা দিয়ে তো দিব্যি

গলে যাওয়া যায়। আর স্রেফ তো বে-আব্রু ব্যাপার! এদিক ওদিকের সবই তো দেখা যায়। কোর্টে বা উঠোনে যদি পার্টিসানই দিতে হয় সিমেন্ট বালি দিয়ে ইঁটের প্রাচীর গেঁথে দিলেই তো হয় মাথা সমান। আর যদি ঐ নিষ্ঠুর অভদ্র খেলা খেলতেই হয় তবে ঐ পার্টিসনের আড়াল থেকে খেলাই তো ভালো। আর ঐ মিক্সড ডবলের খেলায় প্রাচীরের আড়াল থেকে ফুল ছোঁড়াছুঁড়ি তো আরো রোমান্টিক।

তারপরে রাত্রে আলো জেলে খেলা! কেন দিনের বেলায় খেললেই তো হয়। যেমন ফুটবল খেলে, ক্রিকেট খেলে, হকি খেলে? তা নয়, দুধারে দশ বারোটা আলো জ্বালিয়ে রাতকে দিন করে খেলা চাই। অযথা বিজলী বাতি পোড়ানো!

বুঝি নে? আসলে এটা বুর্জোয়া খেলা। তাই কেমন সব সেজে গুজে খেলে। সাদা হাফ প্যান্ট, সাদা হাফ সার্ট, সাদা মোজা, সাদা কেডস। মেয়েদের পরণে সাদা স্কার্ট বা শাড়ি – ফিটফাট সাদাটে ব্যাপার। 'সাদা রুশ'দের মত বুর্জোয়া সব।

কিন্তু তাই বা বলি কি করে? প্রায় তো দেখি ব্যাডমিনটনের মাঠে আলো আনা হয় পাশের বাড়ির মেন থেকে। আর তারা না দিলেই ব্যস—হামলা। খেলা, জলসা আর পুজোয়—আলো বিতরণ করাই নীতি। না দিলে আলো জোর করে আদায় করার অধিকার সকলেরই। এসব ক্ষেত্রে 'আলো এতটুকু দাও গো আমারে'—বলে প্রার্থনা করবার কিসসু নেই।

আর জানি, এই ব্যাডমিনটন খেলার জন্যে এক ভদ্রলোককে তো জমিই বিক্রী করে দিতে হলো। ভদ্রলোকের একটি প্রাচীর ঘেরা জমি ছিল এক পাড়ায়। সেই পাড়ার ছেলেরা জমির ফটকের তালা ভেঙে সেখানে ব্যাডমিনটন খেলতে লাগলো পাশের বাড়ি থেকে আলো নিয়ে। ভদ্রলোক জানতে পেরে তাঁর জমিতে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের জিগ্যেস করলেন তাঁর ফটকের তালা ভাঙবার কারণটা কি? আর বাইরে খোলা জায়গা থাকতে তাঁর জমিটাই খেলার পক্ষে যোগ্য জায়গা বলে ঠিক করা হলো কেন?

তাতে ছেলেরা গম্ভীর হয়ে বললে, আপনার জমিটা বেশ চারধারে ঘেরা, কাজেই কোর্টটা খারাপ হয় না আর হাওয়া এসে বল উড়িয়ে নেয় না।

তারপর বলেছিলো কিনা, বেশি চালাকি করতে এলে খুলি উড়িয়ে দেবো— মিথ্যে কেন বলবো, তা আমি জানিনে।

তবে জানি, ভদ্রলোক আর উচ্চবাচ্য না করে উচ্চ দাম না পেলেও জমিটা গোপনে বেচেই দিলেন।

কাজেই এই খেলার মাধ্যমে জমি জবর দখল করাও যেতে পারে।

যাক, এ হেন ব্যাডমিনটন খেলার ক্লাবে আমাকে একবার উদ্বোধক হতে হয়েছিলো। অপরাধ, আমি একটু লিখি-টিখি। আমি আপত্তি করেছিলাম, দেখুন, ওইসব খেলা আমি বুঝিনে, কাজেই—। তার উত্তরে ক্লাবের ছেলেরা বললো, কেন, আপনি দুর্গাপুজোয় কালিপুজোয় উদ্বোধক হতে পারেন, আর এখানেই আপত্তি। বলি ও সব পুজোর আপনি কি জানেন!

অগত্যা, ঐ ব্যাডমিনটনের বলের মতই চাঁটাচাঁটি খাবার ভয়ে আর তাদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম না। অবশ্য একটু লোভও ছিল না যে তা নয়। না, ফটো তোলার বা কাগজে পাবলিসিটির লোভ নয়—

মানে, প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

মূল্যবৃদ্ধির বিবিধ কারণ

এখন সকলেরই মুখে একই কথা। আর পারিনে।

জিনিসপত্রের দাম চড়চড় করে বেড়ে যাচ্চে। বাড়িতে কর্তা মাথা চাপড়াচ্চেন, গিন্নী বলচেন, সংসারের মুখে ছাই! অফিসে বড় কর্তা সর্ষেফুল দেখচেন, কেরাণীরা বলচে, মাগগীভাতা চাই। সরকার নানারকম মতলব ভাঁজচেন, আর গর্ত থেকে কালো টাকা খুঁচিয়ে বার করচেন। অর্থবিদরা মূল্যবৃদ্ধির কারণ খুঁজতে মাথা ঘামাচ্চেন। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির আসল কারণ খুঁজে পাচ্চেন না কেউই। এযেন কিশোরী মেয়ের যৌবন প্রাপ্তি। যতই মেয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে ততই বাপ মায়ের চোখের ঘুম যায় উড়ে!

সেদিন আমি খুঁজে পেলাম দ্রব্যমূল্যের মাথা চাড়া দেবার অনেক রকম আসল কারণ। বুঝলাম অকারণে বাজারদর মাথাচাড়া দিচ্চে না। বাজার করতে গেছলাম। ট্যাকে যে পরিমাণ টাকা নিয়ে গেছলাম, তাতে টসকে যাবার অবস্থা। বাজারদর শুনে মনে হলো দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্চি। আলুর দোকানীকে বললাম, কীহে, কালকের চাইতে আজকে আলুর দাম এত বেড়ে গেল কেন? লোকটি অম্লান বদনে বললো, আজ খবরের কাগজ পড়েননি বাবু। জানেন না, কাল দমদমের কাছে ট্রেন অ্যাকসিডেণ্ট হয়েচে। যাঃ! অ্যাকসিডেণ্টে আমার কপালটাই আলুর মত ফুলে উঠেচে বুঝি। তেমনি বেগুনের দর বেড়ে গেছে কেন জিজ্ঞেস করায় উত্তর পেলাম, এজ্ঞে ভুটানের মহারাজা ভারতে এয়েচেন যে! সাহস করে বললাম তাতে তোমার আমার কি? বললে, আছে আছে কারণ আছে। গুণবান রাজা এলে বেগুনের দামও বাড়ে। ওসব আপনি বোজবেন না।

সত্যিই বুঝলাম না কিছুই। আগে বুঝতে পারতাম। জানতাম বিয়ের তারিখগুলোয় বাজারের দর বাড়ে, বিশেষ করে দই মিষ্টির। জানতাম সরস্বতী পুজোয় ফল পাকড়ির দাম বাড়ে। খরা বা বন্যায় দাম বাড়াও আশ্চর্যের

নয়। তাছাড়া ইকনমিক্সের মতে ডিম্যাণ্ড অ্যাণ্ড সাপ্লাই ব্যাপারটাও জানা আছে। কিন্তু ঐসব কারণ-ফারণ এখন আর কেউ মানে না। বোধহয় কারণগুলো সেকেলে ব্যাকডেটেড। এখন মূল্যবৃদ্ধির যেসব কারণ শুনচি, সেসব কারণ-বারির কারবারীদের মুখেই শোভা পায়।

মাছের দর হঠাৎ বেড়ে গেল কেন জিগ্যেস করায়, জানালো, জানেন না, ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট খেলা চলচে, দুদিন পরে টেবিল টেনিস চলবে। এটা একটা সত্যিই কারণ। ফুটবল ম্যাচে ইষ্ট বেঙ্গল জিতলে যদি ইলিশ মাছের দর বাড়ে, তবে ক্রিকেট বা টেবিল টেনিসে তো সব মাছের দর ও কদর বাড়বেই। তবে বোঝা গেল, বাজারীরা জিনিস নিয়ে বাজারে আসবার আগে খবরের কাগজটা একবার ভালো করে পড়ে নেয়।

অতএব বাজারে পটল উঠলে তার দর উঠবেই, কারণ খবরের কাগজে মারামারি খুনোখুনির খবর তো রোজই থাকে, আর পটলের সঙ্গে পটল তোলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

হঠাৎ দেখি, পাড়ার রাধাকেষ্টবাবু, সঙ্গে চাকর নিয়ে দিব্যি হেসে হেসে বাজার করচেন। টাকার কুমীর, তাই চাকরের হাতের থলেটাও বেশ ভুঁড়িদার হয়ে গেছে। আমাকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, বাজার করলেন? বললাম, না, বাজার দর শুনচি আর দর বাড়াবার কারণ শুনচি। শুনে হেসে বললেন, কারণ শুনতে যাবেন না। এদের কারণ ব্যাকরণেও লেখা নেই! যা দরকার চোখকান বুঝে কিনে যান, তাতে মেজাজ সরিফ থাকবে! তা বটে। মনেমনেই বললাম,আপনাদের কালোটাকা সাদা করবার ভালো উপায় হচ্চে! আচ্ছা চলি। বলে বিদায় নিয়ে তেল ঘিয়ের দোকানে গিয়ে দর শুনে হাঁ হয়ে গেলাম। দোকানী বললো, হাঁ করচেন কেন? কাল সারারাত পাড়ায় কুকুর ডেকেছিলো জানেন না? চোর এসেছিলো। তাই গৃহস্থরা আর ঘরে টাকা না রেখে ঘি তেল কিনে মজুত করচে। বাজারে আর মাল নেই তাই এত দাম। আর ফলের দোকানী বললো, দর বেশী বলে মন-মেজাজ খারাপ করে দেবেন না বাবু। জানেন, আজ বৌ শাড়ি কিনে নিয়ে যেতে বলেচে, আর বলেচে সন্ধেয় ছিনেমা দেখাতে। বোজলেন কিনা, হারামজাদীর মেজাজ বেশ চড়া। তাই ফলের দরও আমার চড়া।

শুনে নিজের গাল চড়াবার ইচ্ছে করলেও ঝড়াকসে চড়াদামেই কিনে ফেললাম একজোড়া কমলালেবু।

চাদর

সেদিন এক গুণীজন সম্বর্ধনায় গিয়ে দেখলাম উদ্যোক্তারা সেই গুণীজনকে ধুতি-চাদর উপহার দিলেন। চাদরখানা মনে হলো সিল্কের।

আর মনে হলো, ধুতিটা হয়তো ভদ্রলোকের কাজে লাগবে—যদিও ধুতি এখন লাক্সারি আইটেমের মধ্যে। নিজের পয়সায় ধুতি কিনে পরা এখন সুদূরপরাহত ব্যাপার। প্রায় চল্লিশ টাকা খরচ করে, তাও বিশেষ ভালো কিছু নয়, সাধারণ একটা তাঁতের ধুতি কেনো, রোজ বা একদিন অন্তর কাচাও, আর মাস তিন-চার পরে দেখো, ফেঁসে গেছে বা কোথাও লেগে ছিঁড়ে গেছে কিংবা বাসে-ট্রামে উঠতে গিয়ে পা জড়িয়ে তুমিই গেছো উল্টে পড়ে। কাজেই ধুতিকে ধাতস্থ করা আর যাচ্ছে না! (তবে দোহাই মেয়েরা! তোমরা যেন শাড়ি ছেড়ো না। মিনি স্কার্টই পরো, বা ম্যাক্সিই পরো, বা স্লাক্স, যাই পরো—শাড়ির কাছে কোন কিছুই বাহারি নয়। জানো তো, ঘাঘরা পরা মেমসাহেবরা পর্যন্ত শাড়ি দেখে লাল ফেলে।)

যাক, পরস্মৈপদী ধুতিটা হয়তো ভদ্রলোকের কাজে লাগবে। কিন্তু চাদরটা? চাদরটার যে কী গুণ, তা ঐ গুণীজন বুঝবেন? তিনি হয়তো ঐ সিল্কের চাদরটাকে নিয়ে কালই কোন দর্জির দোকানে যাবেন তাঁর গায়ের মাপের পাঞ্জাবি করিয়ে নিতে! কিংবা তাঁর গৃহিণী ওটি ছোঁ মেরে নিয়ে নেবেন নিজের ব্লাউজের জন্যে বা মেয়ে কিংবা নাতনীর ফ্রকের জন্যে।

ঐ গুণীজন কী আর চাদরটাকে চাদর হিসেবেই ব্যবহার করবেন? বোধহয় না। ধুতি চাদরের দিন গেছে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে 'লাঠিরও দিন গিয়াছে।'

কিন্তু আমার তো মনে হয়, এই চাদর পাওয়া মানে হাতে চাঁদ পাওয়া। এই চাদরের চল্ যিনি চালু করেচেন, তিনি নমস্য। এই চাদরের কাছে সার্ট প্যান্ট কোট টাই, কোনটাই কিছু নয়। বয়সের দিক থেকেও একেবারে ছেলেমানুষ!

চাদর কী আজকের? কোট-প্যান্টওয়ালারা যখন পশুর চামড়া কোমরে জড়িয়ে মাংস পোড়া খেতো, তখন থেকেই এই ভারতে ধুতি-চাদরের আদর দেখা দিয়েচে। বড় বড় রাজসভায় পণ্ডিতরা ধুতি পরে চাদর গায়ে দিয়েই আসতেন। কল্পনা করো মহাকবি কালিদাস চলেচেন রাজসভায়, হাতে 'মেঘদূত' বা 'কুমারসম্ভবের' পুঁথি। আর পরণে ধুতি কাঁধে চাদর। শীতকালে ঐ চাদরটাই গায়ে জড়িয়ে রেড়ির তেলের প্রদীপে লিখচেন হয়তো 'রঘুবংশম্'! সেই থেকে আমরা কত রকমের ফ্যাশানের পোশাক পরলাম, কত রকমের আলো জ্বালালাম, কত রকম কী করলাম, কিন্তু মহাকাব্য আর তৈরী করতে পারলাম না।

এখন যেন পোষাক তৈরী করতেই সময় আর উৎসাহ যায় চলে। ধুতি-চাদরের সরলতার দরজাটা ঐ দর্জিরাই যেন বন্ধ করে দিলো। এখন এমন হয়েচে দর্জির দরজায় মাথা কোটা ছাড়া আর উপায় নেই।

অথচ সাদাসিধে চাদর দর্জিকে পরোয়াই করে না। অথচ যা করে তা ভাববার মত। তোমার কাঁধে চড়বে হয়তো, তোমার মাথায় উঠবে হয়তো, কিংবা যদি চাও, তোমার কোমরও জড়িয়ে ধরবে, তবু বেলেল্লাপনা করবে না, বরং তোমার লজ্জা ঢাকবে। চাদর পুরুষদের লজ্জাবস্ত্র।

ধরো, তুমি কোথাও যাবে, একেবারে খালি গায়ে যেতে বলিনে, ধুতি পাঞ্জাবি পরো আর চাদর একটা পাট করে কাঁধে ঝুলিয়ে নাও। ব্যস। কোন বড় অফিসে গেলে লিফটম্যান হয়তো তোমাকে সেলাম দেবে না—না দিক। তারা তো কোট-প্যান্ট পরা লোকটাকে সেলাম দেয় না, কোট-প্যান্টকে দেয়।

কিন্তু দেখো, তোমাকে সবাই চেয়ে দেখবে। ভাববে, লোকটার ব্যক্তিত্ব আছে। মনে হবে, তুমি যেন রাস্তায় হাজার হাজার অ্যাম্বেসেডার গাড়ির মাঝে ওয়েলার ঘোড়া-জোড়া জুড়িগাড়ি চেপে টগবগ টগবগ করতে করতে চলেচো।

হয়তো তর্ক করবে, কাঁধে চাদর নিয়ে আজকালকার ভিড়ে ট্রামে-বাসে ওঠা যায় নাকি? আমি বলবো আলবাৎ যায়। ঐ কাঁধের চাদর তোমার কোমরে

বেঁধে ফেলো। দেখবে একটা মল্লবীরে রূপান্তরিত হয়ে গেছো। আর বাসে-ট্রামে যদি খুবই ভিড় হয়, এমন ভিড় হয় যে কোন রকমে পা-দানীতে পা দিয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে হবে, বেশ, আর দ্বিধা করো না। কাঁধের চাদর নিয়ে হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে নিজের কোমরটাকে বেঁধে ফেলো, আর পড়বার ভয় থাকবে না। এমন কি হাত দুটোও তোমার তখন খালি। যাতে পকেট খালি না হয়ে যায়, হাত দুটো দিয়ে পকেট সামলানোর কাজ করতে পারবে। দেখো, আগে লোকেদের কাছা থাকতো আর ঐ কাছা ধরে বাসে-ট্রামে ওঠা এবং অনেক কিছুই করা যেতো। এখন ঐ চাদরই ভরসা।

বাইরে কোথাও যেতে হবে? যাও, তবে কাঁধে চাদরটা পাট করে নিতে ভুলো না। তাতে মানিব্যাগটা ছাড়া অন্য অনেক কিছু ভুললেও ক্ষতি নেই। এমন কি বেডিং না নিলেও চলবে। যদি হোটেলে ওঠো, বেডের বারোয়ারী গদির উপর চাদরটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ো। হোটেলে না উঠে প্ল্যাটফর্মে রাতটা কাটাতে চাও, পেতে ফেলো চাদরটা।···আরে আরে. শ্যামাচরণ না! তোমার কাছে পঞ্চাশটা টাকা ধার নিয়ে আর দেবার নাম নেই! কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। তোমাকে দেখতে পায়নি। যাও, যাও, চাদরটার দুমুখ দুহাতে ধরে পেছন থেকে গিয়ে ওর গলায় পরিয়ে টেনে আনো! চালাকি! নাও, পেলে তো টাকা! কিন্তু ওর হাত ধরতে গেলে ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যেতো।

রাত্রে বড্ড মশা কামড়াচ্চে? মশারি আনোনি? চাদর তো আছে। মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ো। ভোরে ঘুম থেকে উঠে কাছেই নদীতে স্নান করবার ইচ্ছে। জামা-কাপড় ছেড়ে চাদর পরেই নেমে যাও না? আবার শুকিয়ে নিলেই হবে। পরণের ধুতিটা নোংরা হয়েচে, সাবান দিয়ে কেচে নিলে ভাল হয়? বেশ তো, চাদরটাকে লুঙ্গী করে পরে ফেলো।

আমি তো কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে ধুতি চাদর ধরেচি, অবশ্য গায়ে পাঞ্জাবি। আর ঐ চাদর আড়াল দিয়ে কত বন্ধুর বাড়ি থেকে কত বই সরিয়েচি। গোপনে বলি. আমারও এক পাওনাদারের দৃষ্টি এড়াতে পেরেছিলাম চাদর আড়াল দিয়েই। আবার বুক ফুলিয়ে বলি, রাস্তায় এক ভদ্রলোক হোঁচট খেয়ে পড়ে তাঁর গা আর পা কেটে রক্তারক্তি হলো, আমিই তাড়াতাড়ি আমার চাদরের এক কোণ ছিঁড়ে জল দিয়ে ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম। আর একবার এক বন্ধুর সঙ্গে এক বাগানে বেড়াতে গিয়ে সেখানে একটা সাপ তার পায়ে কাটতেই আমার কাঁধের

চাদর ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি তার উপর-পায়ে তাগা বেঁধে দিয়েছিলাম। তারপরে চিকিৎসা হলো। বেঁচে গেছলো সে। আমি ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি। আমার চাদরখানা কোলের উপর পেতেই তো সারা পথটা তাস খেলা চলে। আর বাড়ি ফেরবার সময় এই চাদরে বেঁধেই সস্তায় কলাটা মুলোটা কিনে নিয়ে যাই। সেবার পিকনিকে রোদ্দুরে আমার চাদরটাকেই তো চাঁদোয়া করে রান্নার কাজ সারা হলো। পরে ঐ চাদরই ভাঁজ করে বসে খাওয়া হয়েছিলো। অবশ্য. মিথ্যে বলবো না, পার্টি'র চাঁদা থেকে চাদরটা কেচে দিয়েছিলো ওরা। আর ওইযে রোদ্দুর বৃষ্টি মাথায় করে চলি, শীতকেও ভয় পাইনে, এই চাদরের কৃপাতেই। রোদ্দুরের সময় মাথায় দিই চাদর। ঘামলে ঘাম মুছি। অল্প বৃষ্টিতে মাথায় দিয়ে মাথা বাঁচাই। বেশি ভিজলে গা মুছি। শীতকালে মাফলার করে গলায় জড়াই বা কান-মাথা ঢাকি।

ঢাক বাজিয়ে চাদরের প্রশস্তি গাইলাম। এর পরও যদি চাদরের আদর কেউ না করে. তাতে চাদরের কিছু আসে যাবে না, সে-ই 'জানিবে না, সে কী হারাইতেছে!' যে বেরসিক ফুলের আদর করে না, সে 'ফুল'—তাতে ফুলের মান কমে না।

আরে বাপু, মনে পড়ে এই চাদরের চাঁদোয়ার তলাতেই তো এক শুভলগ্নে তোমার প্রিয়তমার সঙ্গে তোমার শুভদৃষ্টি হয়েছিলো। দেখেছিলে তাঁর চাঁদমুখখানি।

আর তোমার ঐ চাদরেই গাঁটছড়া বেঁধে নিয়ে এসেছিলে তোমার গৃহলক্ষ্মীকে।

আর এখন যখন বেরুবার সময় তোমার গৃহিণী চাদরখানা পাট করে সযত্নে তোমার কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে সলজ্জ হাসি হাসেন, তখন কী মনে হয়? আমার তো মনে হয়, গৃহিণী যেন সেই বীরাঙ্গণা রাজপুত-রমণীদের মতই বলচেন, হে বীর, জয়ী হোক ইচ্ছা তব।

সার্টিফিকেট ঃ রক্ষাকবচ

সত্যিই, শিল্পী সাহিত্যিকদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বা প্রাইজ হচ্চে রস-পিপাসুদের দেওয়া প্রশংসার পুষ্পমাল্য। সার্টিফিকেট।

এই সার্টিফিকেট শিল্পী সাহিত্যিকদের জীবনে যেমন দরকার, তেমনি দরকার তোমার আমার সকলেরই। সবাই জানে, টাকা না হলে জীবনটাকে টিকিয়ে রাখাই দায়। তার সঙ্গে আর একটি যে বস্তুর বিশেষ দরকার, হ্যাঁ তা এই সার্টিফিকেট। রক্ষাকবচ।

তোমার জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় একটা সার্টিফিকেট দরকার হয়ে পড়ে—বার্থ সার্টিফিকেট। তারপর ধরো অন্নপ্রাশন। সেটিও একটি সার্টিফিকেট ঃ দুধ খাবার ফিডিং বটল ছেড়ে 'ভেতো' হবার সার্টিফিকেট। বামুনের ছেলে হলে আর একটি সার্টিফিকেট পাওয়া দরকার পৈতের সময়। মানে, দ্বিজ হলে তুমি। তারপর শুরু হলো স্কুলমার্কা সার্টিফিকেট—স্কুল-ফাইন্যালের, প্রি-ইউনিভারসিটি, হাইয়ার সেকেণ্ডারী, পার্ট-টু, বি-এ, বি-কম, বি-এস-সি, এম-এ, এম-কম, এম-এস-সি, ডি-ফিল, ডি-লিট—কত কি। এইসব সার্টিফিকেটের মোহ আজও কেউ ছাড়তে পারেনি। তাই তো দেখি পাওয়ার জন্যে প্রাণান্তকর ব্যাপার। দরকার হলে পরীক্ষায় ঢুকে বা গার্ডের বুকে ছুরি মেরেও আদায় করতে হবে ঐ শিক্ষা-সার্টিফিকেটখানা। তারপর মাথায় কালো চৌকো-টুপি আর গায়ে গাউন চাপিয়ে নিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে যে সার্টিফিকেটখানা গোল করে পাকিয়ে বাড়ি নিয়ে এলে, সেটিকে নিয়ে বেরুতে হবে এবার চাকরির চেষ্টায়।

ওতেও কুলোবে না। দু'একজন হোমড়া-চোমড়ার দু'চারখানা সার্টিফিকেট তোমাকে যোগাড় করতেই হবে কাজের জন্যে, যাতে লেখা থাকবে ঃ আহা, এমন ছেলে দেখা যায় না। বড় ভালো গো। চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, এর

চরিত্রে তা-ও নেই। একে কাজে লাগাতে পারো। আবার যদি কোন কারণে সে কাজ ছেড়ে দাও, তবে সেই কাজ-কর্তার কাছে গিয়ে বলতে হবে: আমি অন্য কাজের চেষ্টায় যাচ্চি. কাজেই লিখে দাও আমি বড় বিশ্বাসী, ননীর পুতুল নই এবং অতি সুবোধ বালক।

তারপর বিয়ে। বিয়েটা একটা রীতিমত সার্টিফিকেট। তোমার ভাবী শ্বশুরমশায়টি রীতিমত বাজিয়ে দেখবেন, তুমি তাঁর মেয়ের যোগ্য পাত্র কিনা। এবং তিনি যদি বিয়েতে বেশ কিছু টাকা ঢালেন, তবে বুঝতে হবে, একটা বড় সার্টিফিকেট পেলে তুমি। আর যদি নমো-নমো করে সারেন, তবে বুঝতে হবে, তুমি বাজে সার্টিফিকেট পেলে। মনে রেখো, বরপণের টাকার অংকটা তোমার কেনা দাম শুধু নয়, সার্টিফিকেটও।

মেয়ের বাপের সার্টিফিকেট পাবার পর ন্যাচারালি তোমাকে তাঁর মেয়ের সার্টিফিকেটখানা যোগাড় করতে হবে। কিন্তু তা পাওয়া বড় শক্ত। কেষ্ট ঠাকুরকেও এজন্যে শ্রীরাধিকার পায়ে ধরতে হয়েছিলো: দেহি পদ পল্লব-মুদারম্। এই মন-পাওয়ার চরম সার্টিফিকেট পাওয়া মানে পরম-পাওয়া। পেলে ভাগ্যবান তুমি! অথচ অতি-ক্ষণস্থায়ী এই সার্টিফিকেট। শ্রীমুখের এক ঝামটায় তা স্রেফ নাকচ হয়ে যেতে পারে। যায়ও।

অতঃপর ছেলেমেয়েদের সার্টিফিকেট। তাদের গা মোছানো, জামা পরানো, লজেন্স খাওয়ানো, ভালো স্কুলে পড়ানো, পুজো-আচ্ছায় দামী পোশাক পরানো ইত্যাদি যদি নিয়মিত করতে পারো, তবেই তাদের কচি-ভাষায় কাঁচা সার্টিফিকেটখানা পাবে: বাবা আমাদের কুব ভালো। সে পাওয়াও কম পাওয়া নয়!

তারপর, পাবে না জেনেও টাকা ধার দাও, অন্তত মৌখিক সার্টিফিকেট পাবে একখানা: চমৎকার লোক! এমন দিলদরিয়া মেজাজ দেখা যায় না। ক্লাবে চাঁদা দাও, পাবে প্রেসিডেন্টের চেয়ার-মার্কা সার্টিফিকেট।

শেষে একদিন তোমার—না, না, এখানে তোমাকে না টেনে আমাকে দিয়েই উদাহরণটা দেওয়া যাক—একদিন আমার শিয়রে যখন মৃত্যু এসে দাঁড়াবে, তখনও কিন্তু একখানা সার্টিফিকেট দরকার: ডেথ-সার্টিফিকেট। ওটি পেলে তবেই আমার ছেলেমেয়ে বৌয়ের এবং আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির একটা হিল্লে হবে। আর আমার শ্রাদ্ধের সময় শ্মশান-বন্ধুরা যদি আসেন, ব্রাহ্মণরা ভোজন ও দক্ষিনা পাবার পর আশীর্বাদ করেন, তবেই পাবো উদ্ধার পাবার সার্টিফিকেট।

অতএব জন্ম থেকে মৃত্যু তক নয়, মৃত্যুর পরেও যেমন সার্টিফিকেট দরকার প্রতি পদে পদে, তা যোগাড় করতে আমিও যে ব্যস্ত হবো, তাতে আর আশ্চর্যের কি ?

আমার লেখা প্রথম উপন্যাসখানা তখন সবে বেরিয়েচে। এখন ব্যাপারটা হচ্চে এই, কুমারী মেয়ের বিনুনীতে যেমন লাল ফিতে না বাঁধলে ভালো দেখায় না, স্টেজে নাচতে গেলে যেমন পায়ে ঘুঙুর বাঁধা রীতি, ঘামের গন্ধ ঢাকতে যেমন গায়ে সেণ্ট মাখা দরকার—তেমনি দরকার ছোট সাহিত্যিকের ঢোলে কোন বড় সাহিত্যিকের বাহবা-র চাঁটি, মানে সার্টিফিকেট। প্রথম প্রথম ওটি না হলে সাহিত্যের আসরে নাচতে গেলে পা দুটো কাঁপতে থাকে, তাল কেটে যাবার সম্ভাবনা।

কাজেই আমার উপন্যসখানা বাজারে যাতে কাটে, তার জন্যে বড় দরকার বড় সাহিত্যিকের সার্টিফিকেট। আর বাপু জীবনটাই যখন সার্টিফিকেট ছাড়া কাটে না দেখা গেল, তখন আমার উপন্যাসখানাই বা সার্টিফিকেটের বর্ম ছাড়া বাঁচবে কী করে ? উল্টে গুদামজাত হয়ে থাকতে দেখলে উইরা এসে কেটে সাবাড় করে দেবে।

বেলা তখন দশটা হবে।

ট্রামে বাসে অফিসের ভীড়। কিন্তু টাইম দেওয়া আছে, এগারোটার মধ্যে যেতে হবে। লোক মারফত এসব কাজ হয় না, হওয়াতে যাওয়া বোকামি। এর আগে একদিন গিয়ে উপন্যাসখানা তাঁকে দিয়ে প্রার্থনা জানিয়ে এসেচি, একখানা সার্টিফিকেট আশা করি। তারপর দু'তিনবার গেছি তাঁর ওখানে, ফিরে এসেচি খালি হাতে এবং প্রত্যেকবারই জানিয়ে এসেচি বিনীত করুণ বা কাতর প্রার্থনা। অতএব এবার আশা আছে, নিরাশ হবো না, পাওয়া যাবে সার্টিফিকেট।

ট্রামে ওঠা গেল।

এসপ্লানেডে বদলে কালিঘাটের ট্রাম ধরবো। জয় মা কালি! কিন্তু সীটগুলো সব ভর্তি। দু'জন বসার সীটগুলোর মাঝখানে সরু পথে কয়েকজন ভদ্রলোক রড ধরে ঝুলচেন। আমি তাঁদেরই পেছনের জনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ট্রামের জানলাগুলো বড়ই নীচু। নীচু হয়ে না দেখলে বোঝা দায় কোথায় এলাম। তাছাড়া রাস্তায় কি হচ্চে না হচ্চে দেখা যায় না। দেখা যায় শুধু পাশের ট্রাম লাইন জোড়া, চলে যাওয়া গাড়িগুলোর ঘুরতি চাকা,

চাকা, পথ চলা পুরুষদের নূতন বা ছেঁড়া জুতো আর মেয়েদের শাড়ির পাড় আর খটখটে জুতো। তাতে মন ভরে না।

অতএব প্রাণ ভরে ট্রামের ভিতরের চারধারে সাঁটা বিজ্ঞাপনগুলো দেখতে লাগলাম। বিজ্ঞাপনগুলো নির্লজ্জ বিজ্ঞাপনদাতাদের আপনি-দেওয়া সার্টি-ফিকেট ছাড়া আর কিছু নয়। ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে না! নিজের ঢাক নিজে পেটানো! ছ্যা ছ্যা।…চোখ নিয়ে এসে ফেললাম আমার সামনের ভদ্রলোকের মাথায়। টাক দেখা দিয়েচে, লিভার ফাংশন বোধহয় ভালো নয়। আচ্ছা, আমার নামে যে একটা ওষুধ আছে, ভদ্রলোক খেলে তো পারেন।

ডাক্তারেরা নাকি তাদের সার্টিফিকেট দিয়েচেন ওষুধটা ভালো। আর আমার নামের ওষুধ যখন তখন—

হঠাৎ ডান দিকের একটা সীট থেকে দুজন ভদ্রলোকই উঠে সীটটা পুরো খালি করে দিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সামনের টাক-প্রায় ভদ্রলোকের আর আমার কপাল খুললো। তিনি সুড়ুক করে ঢুকে জানলার দিকে বসলেন, আমি তাঁর পাশে। আমার পেছনের ভদ্রলোকেরা আরো দু'চার পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

আমার বাঁ পাশে গলিতে এসে দাঁড়ালেন যে ভদ্রলোক তিনি হয় গায়ে সেণ্ট মেখেচেন, নয় তো মাথায় সুগন্ধী তেল। কারণ নাকে গন্ধ আসায় চোখে পড়লো তাঁর উপর, ভদ্রলোক ফিটফাট সেজেচেন। বাঁ হাত দিয়ে রডটা ধরে ডান হাতে একখানা বই নিয়ে পড়চেন। বাবা! ভদ্রলোকের আচ্ছা বই পড়া বাই তো! এই ভিড়েও বই পড়তে ইচ্ছে হয়? বেশ বোঝা গেল, এ ভিড়ে ভীরু নন তিনি, এ তাঁর গা সওয়া ব্যাপার, কিংবা বইখানা তাঁর ভালো লেগেচে খুব, তাই এত মনোযোগ। হয়তো কোন গোয়েন্দা কাহিনী।… তরুণ সুদর্শন দস্যু এসেচে বাড়ির কর্তার সিন্দুক ভাঙতে, এমন সময় কর্তার সুন্দরী তরুণী কন্যা এসে নিজেকে দেখিয়ে বলচে: ওগো দস্যু, এই নারী-রত্ন তোমার কাছে বড়, না, ঐ সিন্দুকের ধনরত্ন? অর্থাৎ ভীষণ সমস্যা। অতএব যতক্ষণ সমাধান না হয়, ভদ্রলোক পাঠকটির এদিক-ওদিক তাকাবার উপায় নেই। যাকগে, আমি তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে। বসলে রাস্তাঘাট বেশ দেখা যায়। দেখতে লাগলাম।

একটু পরেই টাক-প্রায় ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, বোধহয় সামনের স্টপেজেই নামবেন তিনি। অতএব আমি আমার হাঁটু জোড়াকে বাঁ দিকে তেরছা করে

একটু জায়গা দিতেই তিনি পাতলা হয়ে বেরিয়ে গেলেন আর আমি ঐ তেরছা-ভাবেই সীট ঘসে সরে যাচ্ছিলাম জানলার দিকে। কিন্তু তার আগেই আমার বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে বইপড়া ভদ্রলোক আমার ছেড়ে আসা জায়গাটায় বসবার চেষ্টা করলেন। অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণ সরে না আসবার আগেই ভদ্রলোক কী আক্কেলে যে বসতে গেলেন জানিনে। অদ্ভুত! বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে একবার দেখবেন তো যে, আমি সম্পূর্ণ সরে গিয়ে জায়গা করে দিয়েচি কি না। ভদ্রলোক প্রায় অভদ্রের মত আমার বাঁ হাঁটুর উপর বসতে গেলেন প্রায়। আমি ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তিভাব দেখালাম, কিন্তু আমার সে ভাব চোখ তুলে দেখবারও দরকার মনে করলেন না। কাজেই আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। নিজের দেহটাকে যতটা সম্ভব সরিয়ে নিয়ে বললাম: নিন এবার বসুন ভালো করে। একেবারে গায়ের ওপর বসতে যাচ্ছিলেন।

এইবার ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন। অর্থাৎ বইয়ের পাতার সঙ্গে আটকানো চোখ দুটো একটু ক্ষণিকের জন্যে তুলে বললেন, মাপ করবেন, বইটা পড়তে পড়তে অতটা খেয়াল করিনি।

জিজ্ঞাসা করলাম, ডিটেকটিভ গল্প বুঝি? বললেন, না একখানা উপন্যাস। বলেই ভদ্রলোক আবার পড়ায় মনোযোগ দিলেন। কি উপন্যাস রে বাবা! এত মন দিয়ে পড়ছেন। দেখতে হচ্চে তো। নিজের গলাটাকে যতটা পারলাম লম্বা করে চোখ দুটোকে তেরছা করে ফেললাম ভদ্রলোকের উপন্যাসের পাতায়। কিন্তু উপন্যাসের নাম দেখেই চক্ষুস্থির! আমারই লেখা উপন্যাসখানা। চোখে পড়লো একটা লাইন যেখানে নায়ক অমিয় বলচে নায়িকা অনুভাকে—যে মেয়ে বিয়ের আগে প্রেমপত্র লিখতে পারে, সে বিয়ের পরও যে কাউকে লিখবে না তার নিশ্চয়তা কি।

এবার চোখ ফেললাম ভদ্রলোকের উপর। আমার পাঠক তিনি! আহা, কি চমৎকার তিনি। বেশ ভদ্র বলেই মনে হচ্চে। শিক্ষিত এবং মার্জিতরুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্চে তাঁর চেহারায় এবং পোশাকে। কোন ভালো কাজই করেন বোধ হয়, দেখতেও বেশ। ভদ্রলোক আমার গায়ের ওপর বসে পড়ছিলেন বলে বিরক্ত বোধ করছিলাম। কিন্তু এখন তিনি আমার মাথায় বসতে চাইলেও বোধহয় আপত্তি করতাম না।

আমি একটু সরে বসলাম, জানলার দিকে।

ভদ্রলোক ভালো হয়ে বসুন, একটু আরাম করে বসে পড়ুন। কিন্তু একটু

পরেই খেয়াল হলো, উঠে পড়া যাক, নেমে যাওয়া যাক ট্রাম থেকে। কী হবে আর সার্টিফিকেটের জন্যে। সার্টিফিকেট তো পেয়ে গেছি আমার পাশে-বসা পাঠকটির কাছ থেকে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সাবধানে সীট থেকে বেরিয়ে এসে ঘণ্টি দিলাম ট্রাম থামাবার জন্য। আমার পাঠক বইখানা পড়তে পড়তে সরে বসলেন জানলার কাছে, আমার জায়গায়। ট্রাম থামতেই আমি নামলাম রাস্তায়।

আমি নেমে আসায় আমার পাঠক তাঁর অজ্ঞাতসারে কিছু হারালেন হয়তো। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতে তিনি আমাকে যে বিশুদ্ধ আন্তরিক সার্টিফিকেটখানা আমাকে দিলেন তা আমি বুকের মধ্যে নিয়ে সযতনে বাড়ি ন্নাম।

ধোঁকা

শ্বশুরবাড়ি দিয়েই শুরু করি।

কাশীপুরে রতনবাবু রোডে গৃহিণীর পিত্রালয় তখন জমজমাট। শ্বশুর মশাইরা তিন ভাই-ই অ্যাডভোকেট, কোর্টে প্র্যাকটিস করেন, ঘর ভর্তি থাকে মক্কেলে।

তাছাড়া আসেন পাড়ার অনেকেই। নিয়মিত আসতেন প্রখ্যাত যাদুকর গণপতি। তাঁর বৈষয়িক ব্যাপারে আসতে আসতে ক্রমে তিনি বিশেষ বন্ধু হয়ে যান বসু পরিবারের। আমি ছিলাম ঐ বাড়ির নতুন জামাইবাবু, আজও নতুন, ঐ বাড়ির নতুনদি-র ভার বহন করবার গৌরবে। বিয়ের পর নতুন গেছি শ্বশুরালয়ে, সামনেই দেখা পেলাম যাদকর গণপতির। দূরে গ্যালারিতে বসে তাঁর ম্যাজিক দেখেচি দেওঘরে। সার্কাসের মত চারধারে গ্যালারি, তারই মাঝখানে সাদা চুস্ত পায়জামা শেরোয়ানী পরে যাদুকর গণপতি বাজনার তালে-তালে ম্যাজিক দেখাচ্চেন আর দর্শকরা চমকে চমকে উঠচে। যাদুকর গণপতি তখন একচ্ছত্র যাদুসম্রাট। বন্ধুবর স্বর্গত পি. সি, সরকার তখন নাবালক, কারণ আমারও তখন তদবস্থা।

এ হেন ম্যাজিক-সম্রাট যাদুকর গণপতি হাতজোড় করে আমাকে নমস্কার জানিয়ে স্বাগত জানালেন : আসুন, আসুন, নতুন জামাইবাবু, আসুন।

রোগা, ছিপছিপে, লম্বা, কাঁচায় পাকায় বাহারি গোঁফ, মাথার চুলও আধপাকা, পরণে ধুতি, গায়ে ফতুয়া, হেসে বললেন, নতুন জামাইবাবু এসেচেন প্রণামী দিতে হয় তো, প্রণামী দিই। বলেই একটা রুপোর টাকা—তখনও এক টাকাটা এক টুকরো কাগজ হয় নি—সামনের বারান্দায় শ্বেত পাথরের বড় গোল

টেবিলটার অপরদিক থেকে গড়িয়ে দিলেন আমার দিকে ঃ নিন। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নিতে যাবো, আশ্চর্য, টাকাটা ঘুরে গিয়ে গড়িয়ে ফের দাতার কাছেই ফিরে গেল। আমি ধোঁকা খেলাম।

পরে দেখেচি, বোস-বাড়ির সব কাজ-কর্মেই খাবার আইটেমের মধ্যে ধোঁকাটা থাকতোই। আর হাতা-বালতি হাতে সেটা পরিবেশন করতেন ঐ গণপতি মশায়। তার আগে মৃদু হেসে এবং কেশে বলে নিতেন, এবার আমি আপনাদের ধোঁকা দেবো। এবং সে ধোঁকার ডালনা তিনি সত্যিই দিতেন, অতিথিদের পাতে পড়তো সত্যি-সত্যিই।

এর আগে জীবনে ছোটখাটো বহু রকমের ধোঁকা যে খাইনি তা নয়। তবে হাসি-হাসি মুখ করে শ্বশুরালয়ের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঢোকবার মুখেই যাদুকর গণপতির কাছে যে ধোঁকা খেলাম, তাতে বুকটা ধক করে উঠলো একবার।

তখন কে জানতো, ওটা প্রথম ধোঁকার ধাক্কা। কপালে আরো আছে। তবু তো তখন শ্যালিকাদের বা ঠানদিদিদের কাছে কানমলা নাকমলা খাওয়াটা উঠে গেছে বাসরঘরে। কিন্তু তারপরে? খেতে বসে দেখি পরিপাটি ক'রে সব সাজানো। রুপোর থালায় অন্নভোগ, আর নানারকমের ভাজাভুজি। চারিদিকে রুপোর বাটিতে থালাটা ঘেরাও। বাটিতে নানা রকমের ব্যঞ্জন। কত রকমের মাছ। একটা বিরাট বাটিতে মাছের একটা বিরাট মুড়ো আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে আছে মাথা উঁচু করে। আর আছে দই রাবড়ি পায়েস আর নানা রকমের মিষ্টি। বেশ একটা এলাহি ব্যাপার · যাকে বলে হুঃ-হুঃ গোছের কাণ্ডবাণ্ড! দেখলেই জিবের জল গড়িয়ে আসে, কিন্তু লজ্জায় তা মুখের মধ্যেই টেনে নিতে হয়। দেখলেই মনে হয় কব্জি ডোবাই, কিন্তু মনটাকে কব্জায় এনে ঠুকরে ঠুকরে পাখির মত খেতে হয়। সামনে শাশুড়ি আর শ্যালিকায় নিজেও তো ঘেরাও! ভাবছিলাম, নতুন জামাইকে খেতে দিয়ে ও'রা কেন চৌড়ির মত পাহারায় থাকেন? খানিকক্ষণ সরে গিয়ে অন্য কোথাও বসলেই তো হয়! এ যেন খেতে দিয়ে খেতে না দেওয়ারই মতলব। শুনেচি, পরে ঐ পাতেই তাঁদের আদুরে মেয়ে বসেন খেতে। যাতে পাতে কিছু মানে, বেশ কিছু থাকে—তাই সামনে বসে থাকা। এও কি ধোঁকা দেওয়া?

থরে থরে সাজানো খাদ্য-সামগ্রীর দিকে নজর বুলিয়ে দেখলাম, না, ধোঁকা দেওয়া হয়নি। তবু ভালো।

খাও বাবা খাও!—শাশুড়ীর অনুরোধ।

আর লজ্জা কেন, খান। ও, আপনি আবার ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানেন না। তা দেবো উল্টে? —শ্যালিকাদের টিপ্পনী।

চল না ঘরে, ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারি কিনা দেখাই গে! —কথাটা বলতে পারা যেতো না কি? যেতো। কিন্তু উপায় নেই, শাশুড়ী ঠাকরুণকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে পেছন থেকে ব্যক্যবাণ ছাড়চে। কাজেই বোকা-বোকা মুখ করে হেঁ-হেঁ করা ছাড়া উপায় কি?

তাই কথা না বাড়িয়ে গুটি গুটি হাত বাড়িয়ে ভাত ভেঙেই দেখি তার মধ্যে একটা বাটি উপুড় করা! আবার ধোঁকা। আর ধোঁকা খেতে দেখে শ্যালিকাদের কী আনন্দ!

কাজেই বাকি আইটেমগুলো দেখে দেখে চেখে চেখে এক্সপেরিমেণ্ট করে খেতে হলো। না, মাছগুলো মাছই, আলুগুলো আলুই। বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই হাত চালাচ্ছিলাম, কিন্তু একখানা ফুলকো লুচি ধোঁকার ডালনায় ডুবিয়ে মুখে ভরতেই মুখটা ন্যাতর প্যাতর করতে লাগলো! বুঝলাম, লুচির মধ্যে ন্যাতার টুকরো।

আবার হি হি হাসি: জানতাম, ছাগলেই কী না খায়। আমাদের নতুন জামাইবাবু দেখচি কাপড়ের টুকরোও খান!—শ্যালিকাদের সরস মন্তব্য।

শুনেচি, তেমন ত্যাঁদড় জামাই হলে ঐ কাপড়ের টুকরো পেটের মধ্যে চালান দিয়ে দেয়। ধোঁকা দিতে গিয়ে নিজেরাই জব্দ হয়ে যায়। জামাই হেসে বলে, কই কাপড়ের টুকরো? আমি তো দেখলাম বেশ ভালো ময়দার লুচি। এইসব মেয়েলি রসিকতায় রাগ করাটা বোকামি। বরং বোকা সেজে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ভাবলাম, এতসব সুখাদ্য থাকতে আর ন্যাকড়া খেয়ে মরি কেন? আর বিয়ে যখন করেচি, ধোঁকা তখন খেতেই হবে। বিয়ে মানেই তো ধোঁকা। তাই মুখের ভেতর থেকে কাপড়ের টুকরোটা বার করে ফেলে দিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে বললাম, ছাগল যখন নই, তখন ন্যাকড়াটা ফেলেই দিই, বরং কাজে লাগতে পারে। তবে জানা থকেলো, এ বাড়িতে ময়দার অভাবে ন্যাকড়ার লুচিও হয়। এবার থেকে এই রকম খাওয়া প্র্যাকটিস করে আসবো। শ্বশুরবাড়ির আদর যত্ন তো ছাড়া যেতে পারে না।

ধোঁকা খেলাম সন্দেশ খেতে গিয়েও। মুখে ভরে দেখি ময়দার ড্যালা

মুখের মধ্যে চপ চপ করচে। থু থু করে ফেলতেই শ্যালিকাদের আবার হি-হি হাসি। আমিও হেসে বললাম, শুনেচি ছানার দরটা খুব চড়া যাচ্চে নাকি। আহা, তবু তো জামাইয়ের পাতে একটা অন্তত সন্দেশ দেওয়াও তো দরকার।

শাশুড়ী ঠাকরুণ হয়তো দেখলেন, জামাইয়ের মুখ খুলে গেছে, কাজেই মুখের সামনে না থাকাই ভালো। তাই সরে পড়লেন তাড়াতাড়ি। বললেন, কী যে তোরা করিস বাপু জানিনে। বেচারীকে স্বোয়াস্তি করে একটু খেতে দিবে তো? আচ্ছা বাবা, তুমি খাও, আমার একটু কাজ আছি, আসি।

তিনি প্রস্থান করলেন এবং পরক্ষণেই মঞ্চে প্রবেশ করলেন সুন্দরী শালাজ। হাতে তার রুপোর পানের বাটা। মুখ হাত ধুয়ে দাঁড়াতেই শালাজ পানের বাটা এগিয়ে দিলো। একটা খিলি মুখে ভরেই দেখি আবার ধোঁকা! নুন দিয়ে পান সাজা। ফেলে দিলাম সে পান। আবার মিলিত হাসি। তবে সামনে শাশুড়ীঠাকরুণ যখন নেই, তখন সুযোগ ছাড়া বোকামি। ফট করে শালাজের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে সুর করে বললাম—

হে সুন্দরী শালাজ!
এত কেন লাজ!
তাই পানেতে লবণ দিয়ে
ওগো প্রিয়ে,
ইশারায় বলো কেন
তুমি লাবণ্যময়ী?
দেখেই মজেচি আমি,
দয়া করো দয়াময়ী॥

*চং! বলেই দয়াময়ী দে লম্বা। এবং দেখা গেল শ্যালিকারাও এদিক-*ওদিকে ছিটকে-ছাটকে গেল। হয়তো ভাবলো, লোকটা ধোঁকা খেলেও ধাক্কা দিতে জানে।

আমাকে ধোঁকা দিতে গিয়ে আরো ধাক্কা খেলো তারা রাত্রে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শালাজ আর শ্যালিকারা আমায় নিয়ে গেল তেতলার ঘরে। ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বললো, শুনগে যান। নতুনদির মাথা ধরেচে, তাই আগেই শুয়ে পড়েচে। ওকে যেন বিরক্ত করবেন না।—বলেই আমার পেছনে ঘরের

দরজা দিলো টেনে। আমি ঘরের আবছা নীল আলোয় দেখলাম, প্রেয়সী আমার বিছানার একপাশে পেছন ফিরে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। পরণে নীল শাড়ি, মাথায় ঘোমটা। আহা বেচারী, সারাদিন হয়তো খাটাখাটনি গেছে, কিংবা দুপুরে ঘুমুতে পারেনি। একটু মাথা টিপে দেবো নাকি? ঘরের দরজার খিলটা লাগিয়ে দিয়ে নববধূর দিকে চেয়ে-চেয়ে গায়ের পাঞ্জাবির বোতাম খুলতে লাগলাম। নীল আবছা আলোয় হঠাৎ যেন মনে হলো প্রেয়সীর মাথা থেকে পশ্চাদ্দেশ পর্যন্ত কেমন যেন বেমানান, একটু বেশি লম্বাটে! হুঁ, সন্দেহজনক। জামাকাপড় বদলে পাশে গিয়ে শুয়ে তার গায়ে একটু টিপুনি দিয়ে দেখি, বেশ শক্ত! বটে, এখানেও ধোঁকা দেবার চেষ্টা! পাশ-বালিশকে বৌ সাজিয়ে শুইয়ে রেখেচে বিছানার এক পাশে! সাজিয়েচে ভালোই, তবে নিখুঁত হয়নি, তাই রক্ষে। নইলে ঐ বালিশটারই মাথা টিপে কত রকম সোহাগের কথা বলতে হতো। আমি আর দেরি না করে উঠে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়লাম। আর একটু পরেই শুরু করলাম নাক-ডাকার শব্দ।

তার একটু পরেই শুরু হলো দরজায় ধাক্কা – নতুন জামাইবাবু, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন।

কে? কে? - যেন ঘুম ভেঙে গেল : কে ডাকচে? বাড়িতে ডাকাত পড়েচে নাকি?

বাইরে থেকে কোন এক সুরসিকা উত্তর দিলো, না, না। এ বাড়িতে যাকে ডাকাতি করেচেন তাকে ঘরে নেবার জন্যেই ডাকাডাকি।

সে তো আমার পাশেই শুয়ে।

ঢং। এখন দরজা খুলুন তো।

ওমা, বাড়িতে তোমাদের ক'টা নতুনদিদি গো?

একটাই।

তবে? সে তো পাশেই! এখন তোমাদের কেউ নতুনদিদি সেজে আমার আর এক পাশে শুতে চাও নাকি? সে আমি পারবোনি বাপু। তোমরা নোকনজ্জার মাথা খেতে পারো, আমি পারবোনি।

ইত্যাদি আরো কিছুটা নেপথ্যে কথা-চালাচালির পরে আলো জ্বালিয়ে দরজা খুলে দিলাম। কারণ শ্বশুরবাড়িতে এসে বিরহ-রাত্রি যাপন করা আর খাবারের দোকানে বসে উপোস করা, একই কথা! দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে

শ্যালিকারা আমার প্রেয়সীকে আমার গায়ে ঠেলে দিয়ে বললো, যা, তোর বরের কাছে যা। বর্বর আমাদের নাজেহাল করে ছেড়েচে।

আমি হেসে বললাম, মাথাটা আমার অনুর্বর, তাই ভাবলাম এ বাড়িতে জামাইকে বোধহয় পাশ-বালিশেই ট্রেনিং নিতে হয়। কিংবা বৌয়ের বদলে শালীদের কেউ আসে হয়তো প্রক্সি দিতে।

অসভ্য! ঠোঁটকাটা! -বলেই শ্যালিকারা পালালো। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললাম, এসো এসো বধূ এসো, খাটে এসে পাশে বসো।

এই যে শ্বশুরবাড়িতে পদে পদে ধোঁকা খাওয়া আর ধাক্কা দিতে পারা---এর মধ্যে একটা আনন্দ আছে। ধোঁকা খাওয়ার এমন ধারা আনন্দ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। তবে সেজন্যে ভাগ্য করে আসতে হয়। বৌয়ের সঙ্গে অনেকগুলি শালী থাকা দরকার। তাহলেই পাওয়া যায় আসলের সঙ্গে সুদের আনন্দ, কিছু কিনে ফাউ পাওয়ার মজা, একশিশি ফুড কিনে বাড়তি একটা প্লাস্টিকের গেলাস হাতানোর লাভ। শালীবাহন দি গ্রেট সবাই হতে পারে না।

তাছাড়া এই রকম সুস্বাদু ধোঁকা খেতে হলে গুডবয়টি হয়ে বাপ-মায়ের কথা মত টোপর মাথায় দিয়ে কোন এক শুভলগ্নে ছাদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। নইলে প্রেম করে বিয়ে করা? সে তো স্রেফ গোড়া থেকেই ধোঁকা দেয়া-নেওয়ার ব্যাপার। আর সে ধোঁকা ডালের তৈরী নয়, বেশনের তৈরী। প্রেমের প্রথমদিন থেকেই চলে অশন বসন কাশন হাসন —সব কিছুরই রেশন মাফিক চলা। দু'পক্ষকেই মেপে-মেপে কথা বলতে হয়, অনেক কিছুই চেপে-চেপে চলতে হয়, খেপে-খেপে এগুতে হয়। প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনই মুখোশ পরে এ-ওকে ধোঁকা দিতে থাকে, আর বুকের মধ্যে ধুক ধুক করে, এই বুঝি ধরা পড়ে। ধরা পড়ে, পরে। দুজনে লুকিয়ে রেজেস্ট্রি অফিসে গিয়ে নাম-সই করে বিয়েটা তো হলো। একটা ছোট ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠাও হলো। তারপর সাজপোশাক খুলতে গিয়ে দেখা গেল দুজনের মুখের মুখোশটাও কখন যেন খুলে গেছে। দুজনে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ধোঁকা দেয়া-নেয়ার ধাক্কায় দুজনেই কুপোকাৎ। দুজনের আসল রূপ দেখে দুজনেই বিরূপ।

তবে যারা বুদ্ধিমনে আর বুদ্ধিমতী তারা এই ধোঁকার ধাক্কায় বুদ্ধু হয়ে যায় না। তারা তখন মনকে বোঝায়ঃ আরে বাপু জীবনে শুধুই তো ধোঁকা আর ধোঁকা। আমাদের চারদিকেই তো চলচে ধোঁকাবাজী।

আমাদের জীবন রঙ্গমঞ্চে আমরা সবাই তো অভিনেতা— পোশাক বদলে গালে মুখে রং মেখে দর্শকদের ধোঁকা দিচ্চি। বাড়িতে যার হাঁড়ি চড়ে না, সে সাজচে শাহানশা বাদশা আলমগীর। সিনেমায় প্রায় সবই তো ক্যামেরার ধোঁকাবাজী!

সব ভোজবাজী। ম্যাজিক। আমরা পয়সা খরচ করে ঐ ধোঁকা খেতেই যাই। জেনেশুনেও ধোঁকা খেতে আমরা ভালোই বাসি। না খেলে জীবনটা যেন পানসে হয়ে যায়।

দেখেচো, নিষিদ্ধ পাড়ায় খাবার দোকানে রুটি আর ধোঁকা কত চালু? কেন? অনেকে বারবধূর কাছে বধূর স্বাদ পেতে যায়। তখন পানীয়ের সঙ্গে চলে ঐ রুটি আর ধোঁকা। প্রেমিক কিছুক্ষণের জন্যে ধোঁকা খায় আর বারবধূটির হয় রুটির যোগাড়।

ঘরের বধূর রুটির জন্যে ধোঁকা দিতে হয় না বটে, তবে স্বামীটিকে পদেপদে ধোঁকা দিতে ছাড়েন না। স্বামীটিও শ্বশুরবাড়িতে ধোঁকা খাওয়ার পর থেকে তাঁর শ্বশুরকন্যার ধোঁকা খেতে থাকেন আজীবন। স্ত্রী জানেন, তাঁর অন্নবস্ত্রের ভার স্বামী নিয়েচেন, নিশ্চিন্ত। কিন্তু শখ-শৌখীন? ঐ পাশের বাড়ির রমাদির মত শাড়ি, কিংবা সেদিন বিয়ে-বাড়িতে একটি বৌয়ের গলায় যে নতুন ডিজাইনের হারটা দেখে এলো, সে সবের জন্যে তিনি আর কাকে ধোঁকা দেবেন— তাঁর আপন মানুষটিকে ছাড়া! কাজেই ধোঁকা দিতে হয়। সোজাসুজি চাইলেই তো কাঁদুনী গাইবে, বাজার বড় খারাপ। মানে, সোজা আঙুলে ঘি কখনো ওঠে? আঙুল বাঁকাতেই হয়। সংসারের অন্য খরচ দেখিয়ে ধোঁকা দিতে হয়, মাঝে মাঝে কর্তার পকেট থেকে হাত-সাফাই করতে হয়ও। ধরা পড়লে বলতে হয়, আমার জন্যে করচিনে মশাই, আমি কিছু সঙ্গে নিয়ে যাবো না।

অথচ কর্তার নিজের বেলায়? সিনেমা, থিয়েটার, রেস্টুরেন্ট, পিকনিক, ক্লাব, আর ছুটি পেলেই বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া— সে বেলায় ঠিক পয়সা জোটে! ধোপাবাড়িতে জামা দিতে গিয়ে কতবার তো সিনেমা থিয়েটারের টিকিট পাওয়া গেছে পকেটে, অথচ জিগ্যেস করো, বলবে, কই যাইনি তো। মানে, কেবল ধোঁকা দেবার চেষ্টা।

মানে, যেদিকে তাকাও কেবল ধোঁকা, ধোঁকা আর ধোঁকা। খবরের কাগজের পাতা উল্টে দেখো, কেবল বিজ্ঞাপনের ধোঁকা। যা নয়, তাই বাড়িয়ে

লেখা। অমুক তেল মাখলে টাকে নাকি ঘন চুল গজায়। অমুকের পরামর্শ নিলে মোটা রোগা হয়, রোগা মোটা হয়। অমুক মিলের ছিটের শার্ট পরতে দেখলে রাস্তায় মেয়েরা নাকি ভিরমি খেয়ে পড়ে যায়। এক টাকার টিকিট কিনলে নাকি বাড়ি হয়, গাড়ি হয় মেয়েমানুষের গোঁফ-দাড়িও হয় বোধহয়। এমনি সব ধোঁকা আর ধোঁকা।

আর সাহিত্যিকরা তো এক নম্বরের ধোঁকা-বিশারদ। আকাশে প্রাসাদ গড়ার কারবার। কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবে এমনি করে যে মনে হয় বুঝি সত্যিই। গল্প বা উপন্যাস পড়লেই তো মনে হয়—কোন মেয়ে বুঝি বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে একেবারে মুখিয়ে আছে। আর ছেলেগুলো বুঝি মেয়েদের জন্যে একেবারে হেদিয়ে গেল। পাঠক বা পাঠিকা যদি ঐ গল্প বা উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকার মত হাতে-কলমে কোন প্রেম-পরীক্ষা করতে যায় তো—কেলেঙ্কারী। অথচ শুনেচি, যে লেখক যত ঐ ধোঁকা দিতে পারে, তারই বইয়ের নাকি কাটতি বেশি। মানে ধোঁকার কাটতি সর্বত্র।

কেন, ভোটের সময়? নেতাদের ধোঁকা-বক্তৃতা? যদি গদি পাই, তোমাদের রাজা করবো। এই করেঙ্গা, সেই করেঙ্গা। ভোটের সময় ভুট্টার খই ফুটতে থাকে যেন। তারপর যেই ভোটপর্ব হয়ে গেল, ব্যস! আর টিকিটি দেখবার উপায় নেই। তবু আমরা ভোট দিই। ধোঁকা খাচ্চি জেনেও ভোট দিই। নাহলে নাগরিক অধিকারটা যে মাঠে মারা যায়! আর নেতারা অভিনেতাদেরই তো মাসতুতো ভাই। তারা জানেন, জনতা ধোঁকা খেয়ে খেয়ে অভ্যস্ত। আর সাইজে বড় বড় ধোঁকা না খেতে পেলে লোকের মনই ভরে না।

আর এই যে পথে পথে বিক্ষোভ-মিছিল। সেও তো এই ধোঁকারই ব্যাপার। অফিস কারখানায়, তোমাদের ভালো করবো বলে মালিকের ধোঁকা দেওয়া, আর মাইনে বাড়ালে কাজ করবো বেশি – শ্রমিকের ধোঁকা। যাকে বলে সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি—ঠিক কথায় ধোঁকাধুকি।···

আসলে যে যেমন পারচে, যতটা করে পারচে, অন্যের পাতে ধোঁকা পরিবেশন করচে। উকিল দিচ্চে মক্কেলকে ধোঁকা, ডাক্তার দিচ্চে রুগীকে ধোঁকা, ব্যবসায়ী দিচ্চে খদ্দেরকে ধোঁকা, গণৎকার দিচ্চে নিরাশকে ধোঁকা।

তাছাড়া সারা বিশ্বেই তো এখন চলেচে ধোঁকার কারবার। পাক, পিকিং

জাপান, ভিয়েৎনাম, মস্কো, ইউনেস্কো, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইজরেল, আরব, লণ্ডন, ওয়াশিংটন -টন টন ধোঁকা ম্যানুফ্যাকচার করচে আর গরমা-গরম গুঁজে দিচ্চে এর-ওর মুখে—মুখর মুখ বন্ধ করবার জন্যে। ডিনার-পার্টিতে আজ ধোঁকাই মেন আইটেম। সমাজে বা রাজনীতির আসরে খোলাখুলি কিছু করা বা বলা অভদ্রতা। করতে হয় ধোঁকাবাজীতেই বাজীমাৎ।

আর সত্যি বলতে কি, এই ধোঁকার ধাক্কায়-ধাকায় আমরা জীবনের পথে ধাপে-ধাপে এগিয়ে চলেচি। ধোঁকা যেন এঞ্জিনের কয়লা, এনিমিয়া রুগীর পথ্য আর টনিক। ··

কী লিখচো এত ছাই-পাশ। এসো, খাবে এসো। —গিন্নীর মিষ্টি মধুর ডাক।

লেখা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি খেতে গেলাম। দেখি, ভাতের থালার পাশে একটা বাটিতে ধোঁকার ডালনা।

ভাতের সঙ্গে ধোঁকার ডালনা মাখিয়ে একগ্রাস মুখে তুলে হেসে বললাম, বাঃ বেশ তো হয়েচে ধোঁকাটা !

গিন্নী ঝটকা দিয়ে বললেন, কেন, এর আগে আমার হাতের ধোঁকা খাওনি বুঝি ?

ধোঁকা খাওয়ানো এইখানেই শেষ নয়, আরো আছে। যেমন পুনশ্চ !

গৃহিণী ক্রমেই ধোঁকা-এক্সপার্ট হয়ে উঠলেন। ধোঁকা দেওয়ায় তো বটেই, ধোঁকা রচনায়, মানে ধোঁকা রান্নায়।

তাঁর ধোঁকা নাকি সুস্বাদু, উপাদেয়। (তবে গোপনে বলি, মাত্রা বেশি হলে বেগ-তিক।)

এ হেন ধোঁকার প্রশংসা শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বনফুল, মানে বলাইদা-র কানে গেল। হয়তো কেউ তাঁর কানে ওঠালো।

কথাটা আমার কানে যেতে আমিও গৃহিণীর কানে কথাটা ওঠালাম।

বললাম, বলি, বলাইদাকে ধোঁকা দিতে পারবে ?

ধোঁকা ? দাদাকে ! কেন ?—অনেক প্রশ্ন করলেন।

বললাম, না, না, সে ধোঁকা নয়—সেজন্যে তো আমিই আছি। এ ধোঁকার ডালনা ! চলো দাদাকে খাইয়ে আসি।

শুনে গিন্নী খুবই খুশি।

তখনি আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

পরদিনই ধোঁকার ডালনা রান্না করে টিফিন-কেরিয়ারে ভর্তি করে দুজনে চললাম লেকটাউনে দাদার বাড়িতে।

এবং কদিন পরেই গৃহিণী ডাকে পেলেন ধোঁকার সার্টিফিকেট। আন্তরিক সার্টিফিকেট, ধোঁকা নয়। অর্থাৎ ধোঁকা দিলেও প্রশংসা পাওয়া যায়।

বনফুল ছন্দে লিখলেন—

শ্রীমতী বেলা ঘোষ

কল্যাণীয়াসু,

বয়স আমার অনেক হ'ল
নই তো এখন খোকা
পথ চলতে যখন তখন
খাই না এখন ধোঁকা।
তোমার ধোঁকা খেয়ে কিন্তু
হলাম আনন্দিত
মনে হ'ল বড়া এ নয়
ঠিক যেন অমৃত।
মাল মশলা বাজারের নয়
খাঁটি ও খানদানী
হৃদয়-ভাণ্ডার থেকে
করেছ আমদানী।

আশীর্বদ করি
অন্নপূর্ণা হও তুমি
রাজ-রাজেশ্বরী।

শুভার্থী
তোমার দাদা
বনফুল
(শ্রীবলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়)

কলকাতা কলকাতাই

ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন, 'রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।'

কিন্তু এখন শুধু রেতে মশা আর দিনে মাছি নয়, অনেক কিছুর সঙ্গেই হরিহর-আত্মা হয়ে আমরা কলকাতায় আছি ঠাসাঠাসি, ঘেঁসাঘেঁসি এবং পেষাপেষি হয়ে। এখানে আকাশে ধোঁয়া, রাস্তায় ধুলো, গলিতে জঞ্জাল, ফুটপাথে গোবর, মোড়ের মাথায় ষাঁড়, পার্কে করুণ ফুল-বাগান এবং পথে হরদম বাস ট্রাম রিক্সা ট্যাক্সি টেম্পো ঠেলা সাইকেল ছ্যাকরা গাড়ী ইত্যাদি হরেকরকমবা নিয়ে আমাদের এই কলকাত্তাই সংসার। তাছাড়া বড় ঢাউস-ঢাউস মোটর গাড়ীগুলোও কলকাতার বাহার এবং চোখের বালি। বর্ষায় এগুলো কখনো গায়ে কাদা ছিটোয়, কখনো বা ছিটকে এসে গায়ে মারে ধাক্কা। তবু এদের দেখলে কিন্তু চোখ দুটো জুড়িয়ে যায়ঃ কেমন চকচকে, ঝকঝকে, পালিশ এবং মালিশ করা।

আজকের কলকাতা ভঙ্গ-বঙ্গের রাজধানী। কাজেই সহরটাও বুঝি ভঙ্গ-কুলীন। তাই বুঝি সহরটার এখানে ওখানে সেখানে নানা রাজ্যের রাজত্ব, এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে বঙ্গবাসীগণের বিনীত বাস—অনেকটা ফিল আপ দি ব্ল্যাংকের মতই। যেন কলকাতার তানপুরাটায় জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারই। এই সহরের পথেপথে নানা ঢংয়ের প্রদর্শনী। কোট, প্যাণ্ট, পায়জামা, ধুতি, পাগড়ী, টুপি আর ক্যাপধারী রকমারি পুরুষের যেমন প্রাদুর্ভাব, তেমনই শাড়ী, স্কার্ট, সালোয়ার, পায়জামা-ধারিণীরাও সংখ্যায় কম নন। সত্যিই, কলকাতার সহরে কি নেই? কিসের অভাব? এখানে আছে

রং-করা মেয়ে, জং-ধরা পুরুষ, বহুত শেঠ আর অগুন্তি ঘাটের বাছারা, পকেটমার আর ছাইমাখা সাধু, ৪২০ আর চারশো সমাজ সেবক সমিতি, টাকার গদীতে অম্বুলে রুগী আর ডাস্টবিনের পাশে ম্যয় ভুখা হুঁ। তাছাড়া দশটা-পাচটায় চরকীতে বাঁধা অগণিত কেরাণীকুল, বিড়িফোঁকা শু-শাইন ছোকরার দল এবং বহু ফকির আর ফিকিরবাজ।

কলকাতা নাকি মিছিল-নগরী। হয়তো বা। কারণ এখানে সকাল দশটায় মিছিল, বিকেল পাঁচটায় মিছিল, খেলার মাঠের দিকে মিছিল, কর্তাদের বক্তৃতা শুনতে মিছিল ইত্যাদি তো মিছিমিছি নয়! প্রতিদিন প্রতিক্ষণে এই যে নানা জাতের গায়ে গা ঘেঁসে চলা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলা—এ চলায়-'মিছিল' বা শৃঙ্খলা আছে বলেই তো আজও এই পাঁচমিশালী সহরেও দেখি কেমন দিব্যি ভাই-ভাই ভাব। আর অবাঙ্গালী হিসেবী-ভাইদের কাণ্ড দেখেও 'দাদা-ভাবে' বিভোর এই মিছিল নগরীরই বঙ্গ-নাগরবৃন্দ।

বিক্ষোভ? তাও হয়তো আছে। কিন্তু বাঙ্গালীর বিক্ষোভ আর জলের বুদবুদে যেন কোন তফাতই নেই। বাঙ্গালী মার খায় তবু কিন্তু মারমুখো হয় না। বরং তখন মুখর হয়। সরবে বিক্ষোভ-সভা করে, সভায় বড় বড় প্রস্তাব পাশ করে ভালোভালো ব্যকারণের ভাষা দিয়ে। পরে সবান্ধবে পাঞ্জাবীর দোকানে কষা মাংস বা মাদ্রাজী রেষ্টুরেণ্টে কফি খেয়ে ছোটে সিনেমায় বা খেলার মাঠে অথবা পাড়ার রকাড্ডায়। মানে, পরদিন কাগজে নাম বেরুলেই যথেষ্ট, প্রস্তাব মত নাই বা হলো কাজ!

কাজেই কলকাতার মিছিল বা বিক্ষোভ-সভা দেখে ভয় পাওয়া আর ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখে দড়ি ছিঁড়ে পালানো, একই রকমের বিভীষিকা। কারণ মুখর কলকাতার আদিবাসী খরতর বাঙ্গালীর জীবনে আজ বহু ঝামেলা, হরেক ঝঞ্ঝাট, তাই কিছু একটা নিয়ে লেগে থাকবার মত সময় কোথায়? মজুরীও পোষায় না। দৈনন্দিন চাল-ডাল-তেল-নুন-কয়লা-ঘুটে তো আছেই, তা ছাড়া অছে খবরের-কাগজীয় রাজনীতি, চায়ের কাপের তুমুল তর্ক, রকাড্ডায় রাজা-উজির হত্যা, এবং সন্ধ্যায় ক্লাবে নাটক রিহিয়াশাল, সংস্কৃতি সম্মেলন, সঙ্গীত অনুষ্ঠান, স্বরচিত কবিতাপাঠ, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সাহিত্য সম্মেলন, চিত্র প্রদর্শনী আর চাঁদা করে পত্রিকা প্রকাশন। হ্যাঁ, কলকাতায় বাঙ্গালীর বৃহৎ কাজ। আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে মুখ বদলাবার মতই আছে হরতাল, সত্যাগ্রহ, ট্রাম পোড়ানো ,বাস পোড়ানো,

াক ক্ষেপানো, চাঁদা ওঠানো, মাইক বাজানো, ঝাণ্ডা ওড়ানো। ইয়ার্কি? াজেই একটা কিছু নিয়ে একনিষ্ঠ হওয়া অন্তত কলকাতার বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট ্র। সত্যিই কলকাতার কল্‌জে শক্ত।

কলকাতা মুখর। ভোর রাত্রে সেই যে ময়লা তোলার গাড়ির আওয়াজ দয়ে শুরু, পরে ভোঁ ভোঁ বাজে কারখানার বাঁশি, ঠন-ঠন চলে প্রথম ট্রাম— ারপর সারাদিনটা শুধু হৈ হৈ রৈ-রৈ আর হারে-রে-রে! শুধু ছোটাছুটি, ুড়োহুড়ি। মনুমেণ্টটাকে 'বুড়ি' করে দিনরাত কানামাছি খেলা। পথে পথে া মাড়িয়ে চলা, ল্যাং মেরে চলা, ঝুলে ঝুলে চলা, দ্বিধায় দুলে চলা—একটু কাথাও হাত পা মেলে বসবার যো নেই। তাই তো ডালহৌসি স্কোয়ারের াগান হটিয়ে কথা-চালাচালির ব্যবস্থা আর চলাচলের লৌহপথ। কার্জন াার্কের বেঞ্চ উঠিয়ে 'ঝুলন-যাত্রা'র আয়োজন। গড়ের মাঠ একেবারেই বেকার। ার পুস্করিণী নিষ্প্রয়োজন। এখন মেট্রো রেলের কৃপায় মাটি ভরপুর। লকাতার মাটির তলা দিয়ে পাতাল রেল আর উপরে চক্ররেলের চক্রান্ত। ঙ্গার ধার মালের গুদাম।

কলকাতায় হাওয়া নেই, আছে হাওয়াই-গাড়ি, হাওয়াই-চটি আর াওয়াইন সার্ট। নিঃশ্বাস বন্ধ করে জীবন-যাত্রায় ছুটে চলা—একটু স্বস্তির নঃশ্বাস ফেলবার আশায়। আর মাঝেমাঝে দেখা যায়, ফুল দিয়ে সাজানো াাড়িতে চড়া সংসার রথের 'লার্ণার ড্রাইভার, কোনো কন্যা-বহনে চলেচেন। যন রুদ্ধ-জীবনের একঝলক ফুলের হাসি।

তবে—কলকাতা কলকাতাই। খেয়ালী, খাপছাড়া অদ্ভুত। এখানে গাছ নেই, সবে গজাচ্চে, তবু চির সবুজ। মাটি নেই, তবু ফসল-ভরা। ইঁট লোহায় কঠিন, তবু রীতিমত সরস। মেয়েরা গটগট চলেন, কিন্তু ট্রামে বাসে ভয়াবহ লেডিজ সীট। এখানে Employment Exchange আর সিনেমার ামনে সমান লম্বা লাইন। অধিকাংশই বেকার, তবু সরকারের আয়কর াদায় এখানেই বেশি। এখন এ সহরে যার আছে পুঁজিপাটা, সেই যায় বলেঘাটা, সেলট্যাক্স অফিসে।

কলকাতা যেন সিনেমার নটী। প্রথম বয়সে লিকলিকে যেন তনুলতাটি।

পরে নাম যশের সঙ্গেসঙ্গে মেদ মাংসের ভারে তনু হ'য়ে দাঁড়ায় বপু। কলকাতার 'বপু' আজও চারদিক ব্যেপে বাড়চে।

কলকাতার দক্ষিণে আর বাড়বার মত জমির দাক্ষিণ্য দেখা যায় না। গড়ি পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে। পশ্চিমে মা গঙ্গা আড় হ'য়ে শুয়ে কলকাতাকে বলচে বাড়তে চাও, ডিঙিয়ে যাও। মা বলে তো আর ভক্তিছেন্দা নেই। অ ডিঙিয়েচোও তো কয়েক জায়গায়, আরো ডিঙোবার তাল করচো।

কাজেই কলকাতা পশ্চিম পাড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

তবে উত্তরে এগিয়েচে অনেকদূর। যাকে বলে, সহর থেকে গ্রামে। অ সেখানকার হালচালও করে তুলচে সহুরে।

তাই কলকাতার কলেবর বৃদ্ধির ফাঁক যা আছে পূর্বে। আজ পূর্বাঞ্চ তাই চঞ্চল। বন কেটে বসত তৈরী হচ্চে। মাটি কেটে লেক হয়েচে বেলেঘাটায় আবার গঙ্গার বেলে মাটি দিয়ে ভরাট হয়েচে সল্ট লেক আর খাল-খন্দ অর্থাৎ হিঁয়াকা মাটি হুঁয়া। কাজেই সে মাটি আর 'মাটির দামে' বিক্র হয় না—টাকা মাটি ক'রে মাটি কিনতে হয়। অগত্যা পূর্বাঞ্চলের নতু বাসিন্দারা তাই কেনেন, ভাবেন, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি।

এসব কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট-এর কলাকৌশল। Trustworth হলেও মেকআপম্যান যেন। খানা বুজিয়ে খাশা ব্যবস্থার ব্যবসায়ী। কালে মেয়েকে রং মাখিয়ে পার করচে যেন। সোজা লম্বা রাস্তা, 'চওড়া-চওড়া' পী পালিশ। দু'ধারে ফুটপাথ। ফুটপাথে গাছের সারি। খাড়া-খাড়া লাইট পোষ্ট। মাঝে মাঝে পার্ক। একটা 'হুঁ হুঁ' ভাবের ভাব যেন সর্বত্র।

কাজেই হু-হু করে বাড়ী উঠে যায়ঃ একতলা, দোতলা, তেতল সাততলা পর্যন্ত। সব দেখবার মত বাড়ী। রঙ বেরঙের, নতুন ঢং-এর।

কিন্তু এইসব নতুন পাড়ায় বাড়ী খোঁজাটা গরু খোঁজার মতই ব্যাপার পুরোনো পাড়ার মত ৪৪নং-এর পাশেই ৪৫ নং থাকে না। হয়তো পি ৪২০ পাশেই থাকে পি ৪৮০। আমেরিকার পি এল ৪৮০ খাদ্যশস্য পেটে হজ হ'য়ে যায় বাড়ী খুঁজতে-খুঁজতে। তাছাড়া কোথাও রক নেই, কাজেই রকাড্ডাও নেই—কাজেই বাড়ীর নম্বর জিগ্যেস করবারও উপায় নেই। তবে কোন স্থানীয় লোকের সঙ্গে দেখা হলে নামটা বললে—তাঁর জানা থাকলে তিনিই নবাগতকে

পৌঁছে দেন তাঁর লক্ষ্যবস্তুটির কাছে। অর্থাৎ এসব পাড়ার প্রায় বাড়ির মালিকই স্বনামধন্য।

তাহাড়া নতুন পাড়ার বাসিন্দারা রীতিমতই ভদ্রলোক। বেশ একটা মিষ্টি-মিষ্টি ভাব। কোন কিছু হলে সবাই মিলে যাওয়া, সুখে-দুঃখে খবর নেওয়া, কর্তাদের সব 'দাদা-দাদা' আর গিন্নীদের সব 'দিদি-দিদি' ভাব—আর সবার মনেই পাড়াটাকে ভালো করে গ'ড়ে তোলার সংকল্প। কাজেই খোলা জায়গায় কাউকে ইঁট পুঁততে দেখলে খুশিই হন সবাই : আর একজন 'দাদা' বা 'দিদি' বাড়লো।

আর কলকাতার পুরোন পাড়ার নতুন কেউ আসুক ! নাক সিঁটকে সরে থাকাটাই নিয়ম যেন।

এমন করেই কলকাতা বাড়চে।

তার নাম বাড়চে, মান বাড়চে, দর বাড়চে, দাম বাড়চে। তাই ক্রমে লোক বাড়চে, জন বাড়চে, বাড়ি বাড়চে, গাড়ি বাড়চে—আরো কত কি বাড়চে।

কলকাতার কলেবর বাড়চে দিনকে দিন।

কলকাতা ঐতিহাসিক। প্রায় তিনশো বছর আগেকার জব চার্ণকের তিনটে গণ্ডগ্রাম, সুতোনুটি, কালিকটা আর গোবিন্দপুর আজ বিংশ শতাব্দীতে ডাকসাইটের মহানগরী। সেদিনের ছোট্ট গ্রাম চেরাঙ্গী আজ রহস্যময়ী চৌরঙ্গী। সেকালের পচাডোবা মাটির ঘর আর কাদামাটি এখন দামের দিক দিয়ে প্রতি কাঠা পঞ্চাশ হাজারি-কটাক্ষ। কিংবা তারও বেশি।

হবে না কেন ? এই মাটিতেই যে যুগস্রষ্টা রাজা রামমোহনের কর্ম, যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র, পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের কর্মভূমি, বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সেবায়তন, বিশ্বকবির কাব্যকানন, দেশবন্ধুর কীর্তিস্থান, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজন্ম স্বপ্ন।

এই মহানগরীতেই জেগেছিলো প্রথম জাতীয়তাবোধ—হিন্দু মেলায়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি এই মহান নগরীরই এক মহান নাগরিক। স্বাধীনতার আন্দোলনে এই মহানগরীতেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিলো 'বন্দেমাতরম'। ঋষি অরবিন্দের প্রথম ধর্মপ্রচার এই মহানগরীতেই। এই মহানগরীতেই মহাত্মা গান্ধী প্রথম ঘোষণা করেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর অসহযোগ

নীতি। আর এই মহানগরীতেই ইংরেজের বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব হয়েছিলো বানচাল।

আর, আশ্চর্য, স্বাধীনতার মূল্য দিলো এই মহানগরী কলকাতা—ভঙ্গ-বঙ্গের অভিশাপ মাথা পেতে নিয়ে। মহাপ্রাণ কলকাতা নগরী দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলো ছেড়ে আসা গ্রামের উদ্বাস্তু বঙ্গসন্তানদের। সারা ভারতের জন্যে নিজেই করলো আত্মত্যাগ। কলকাতা 'ভরা-কোল' হলো।

তাই বলছিলাম, কলকাতা—কলকাতাই। আজব সহর। এখানে হোটেল, রেস্তোরা, কাফে, নাইট ক্লাব আছে—আবার উদার ধর্মশালারও অভাব নেই।

তাছাড়া সবার জন্যে দরাজ শান-বাঁধানো ফুটপাথ তো আছেই!

নিমন্ত্রণের অক্টোপাশ

বিয়ের মাস মানেই সর্বনাশ ! চলে নিমন্ত্রণের অক্টোপাশের রুদ্ধশ্বাস মাস বা ট্যাক্সো গোণার মাস। তাও বছরে একবার নয়, বারবার। বারো মাসে সাত মাস। আর গড়পড়তায় মাসে তিনবার করে এই বিয়ের বায়না নেওয়া মানেই—বছরে একুশবার ট্যাক্সো গোনা। একুশবার তোপ দাগার মতই চমকে-চমকে উঠতে হয়।

বিয়ে মানেই তো অক্টোপাশের বন্ধন। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়া। আর একবার বাঁধা পড়লে নট নড়ন চড়ন, নট কিচ্ছু। সেই শেষদিনে ঘাটে যাবার জন্যে খাটে চড়লেই মুক্তি। তখন ঘাড়টা এমনই নড়ে, যেন বলে—আর না, আর না।

যাকগে ওসব কথা। এখন কথাটা হচ্চে এই—তুমি সখ করেই হোক, বা দরকার বলেই হোক বিয়ের সাতপাকে, আসলে কিন্তু অক্টোপাশের অষ্টপাকে বাঁধা পড়তে চাও—বেশ, ভালো কথা। এখন তোমার চোখে রঙীন আশা, মনে গোলাপী নেশা—কাজেই হয়তো খেয়াল নেই, ছাদনাতলার ঐ জুঁইফুলের সুগন্ধী মালাগাছটি আসলে কিন্তু গলার ফাঁস। সেটা বোঝোনি বলেই তোমার মুখখানি বেশ হাসি-হাসি, মনটা বেশ ফুরফুরে।

কিন্তু ব্রাদার, তুমি আমাদের ফাঁসিয়ে দেবার জন্যে অমন হাসি-হাসি মুখ করে এসে একখানা বড়খামে মোড়া রঙচঙে 'সমন' বা নোটিশ হাতে ধরিয়ে দিতে চাও কেন ? ওটি বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র ? কিন্তু দেখলেই যে মন নিম-তেতো হয়ে যায় ! বুঝি তো, তুমি অক্টোপাশের বাঁধনে পড়বার আগে আমাদেরও ঐ অক্টোপাশের বাঁধনে ফেলতে চাও।

তুমি তো ব্রাদার বাড়ি বয়ে এসে, দিব্যি হেসে-হেসে কেশে-কেশে বলে গেলে—এসো ভাই কিন্তু, এসে দাঁড়িয়ে দায়-উদ্ধার ক'রো।

কিন্তু তার আগেই তো বসিয়ে দিয়ে গেলে! মানে, খালি হাতে তো যাওয়া যাবে না। তাই তুমি চলে গেলেই গিন্নীকে নিয়ে বসে-বসে তোমাকে মাপতে শুরু করা হলো।··· না, না, তোমার লম্বা-চওড়ার মাপ নয়, বা তুমি ওজনে কত ভারি, তাও নয়! তোমার পায়া-ভারি কতটা মাপতে হবে বৈকি! সেই মতই তো দক্ষিণা।

তুমি ভিপ্ না ভপ্—ভি-আই-পি, না, ভেরি অর্ডিনারি পার্সন, মানে ভি-ও-পি—তাই বুঝেই তো ব্যবস্থা! তোমার বাড়ি-গাড়ি আছে কিনা, না, বাসাবাড়ি, বাসে চড়ো—তুমি জীবনে পদস্থ, না, পদে পদে অপদস্থ, তাছাড়া তুমি এ বাড়িতে নিমন্ত্রণে এসে কতটা হাত খুলেছিলে, তারও হিসেব করতে হবে বৈকি। অর্থাৎ সব কিছুই অর্থনৈতিক আর সামাজিক দাঁড়িপাল্লায় মাপা দরকার। এবং সেইমতই কিনতে হবে দামী শাড়ি, গয়না বা মাটির ফুলদানি একটা!

তারপর আরো দেখতে হবে, নিম-নিমন্ত্রণ পত্রটায় কী লেখা আছে—শুধু 'আপনি' না 'সবান্ধবে'। অর্থাৎ সে সন্ধ্যায় গেরস্থের বাড়িতে উনুনে আগুন দিতে হবে, কি হবে না। সেই বুঝেই তো টাকার অংকের ওঠা-নামা!

এই হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজী—বললে চলবে না। অথচ মেলানো বড় শক্ত। হিমসিম খেতে হয়। অক্টোপাশের বাঁধনে পড়ে প্রায় দম বন্ধ হয়ে যায়!

আহা, শুনেচি, আগে নাকি যে অবস্থার লোকই হোন না কেন, একটিমাত্র রুপোর টাকা দিয়ে নববধূর মুখ দেখতেন। তাতে নিমন্ত্রিত সকলেরই মুখ থাকতো।

এখন এই মুখপোড়া সমাজটা মানুষের মুখ পোড়াবার জন্যে যেন মুখিয়ে আছে। দার্জিলিং পাহাড়ের মতই নাক-উঁচু করে আছে, আর খামখেয়ালী উঁচু-নীচু। এখানে উঁচু, নীচু হতে চান না। আর নীচু, উঁচু হতে গেলেই মাথায় ঠোক্কর খান, বুকে টান ধরে, পকেট কাটা যায়।

যাক, সে রাম আর অযোধ্যার কথা ভেবে লাভ নেই। এখন ভাবনা—কী করি উপায়!

নিমন্ত্রণ পত্রখানায় লেখা—অমুক নিবাসী অমুকের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান

অমুকের সহিত অমুক নিবাসী অমুকের মধ্যম কন্যা কল্যাণীয়া অমুকের শুভবিবাহ হইবে···। হইবে তো হইবেই, ভালোই। আমরা নিজ বাসভবন হইতেই নবদম্পতির কল্যাণ কামনা করিতেছি।··· না, তাহা হইবে না! সশরীরে যাইতে হইবে, কিছু বা বেশ-কিছু দিতে হইবে, পাত পাতিয়া বসিতে হইবে। অর্থাৎ পাতে বসিবার জন্য পাত্তি গুণিতে হইবে।

অথচ ঐ নিমন্ত্রণপত্রেই লেখা থাকে—লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদই প্রার্থনীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণ-বিধি প্রযোজ্য।···কিন্তু কোনোটাই প্রযোজ্য হতে দেখা যায় না। সেই উপহার আর কব্জি-ডুবিয়ে আহার!

আর ও পক্ষেরও কী কম ঝামেলা! এই আন্, ঐ আন্, দই আন্, মাছ আন্—আন্ আন্ সব আন্। জ্বান্ কয়লা ওঁদেরও। সাত-ঝামেলার অক্টোপাশে ওঁরাও ছটফট করচেন—ফুটচেন যেন।

অথচ উপায় নেই।

বিয়ের নেমন্তন্নের ফর্দ করবার সময় কর্তা মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, হ্যাঁ গো, এবার আয়োজনটা একটু কম করলে হয় না? এই যেমন···। শুনেই গিন্নী আঁতকে উঠলেন, বলো কি গো! আমরা তো গুণ্টিসুদ্দু ওঁদের ওখানে গিলে এসেচি, আর ওঁদের তুমি বাদ দিতে চাও? ঐরকম ওঁদের ওঁদের ওঁদের—অনেকেরই বাড়িতে পাত পাতা হয়েচে। তাছাড়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন, কুটুমবাড়ি তো বেড়েচেই! অতএব···অতএব নিমন্ত্রণপত্র হাতে ছোটো উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, পূব থেকে পশ্চিমে।

এবং এলাহি কাণ্ড। সেজন্যে দেনা করতে হয়—তা হোক! ধার দেনা বড়, না মান-সম্মান বড়? ধার-দেনা কেউ দেখতে আসবে না, কিন্তু কিপ্টেপনা দেখলে—ছ্যা ছ্যা ছ্যা। কাজেই এধার ওধার সব ধার বাঁচাতে গেলে ধার করাটাই নিয়ম!

অর্থাৎ সংস্কারের অক্টোপাশের বাঁধনে আমরা দুপক্ষই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

আবার নিমন্ত্রণ-পত্রাঘাত যখন একাধিক ঘাড়ে এসে পড়ে, তখন তো মাথায় বজ্রাঘাত! একই দিনে তিন-তিনটে নেমন্তন্ন! একটা টালায়, একটা টালিগঞ্জে আর একটা হাওড়ায়। তাঁদের সকলেরই আন্তরিক আমন্ত্রণ যেতেই হবে।···

এই নেমন্তন্নে যাওয়া আর এক ঝামেলা। সে আর এক হুজ্জুত। বাদুড় ঝোলার ব্যাপার!

এই তো সেদিন আমার কি হলো? দু'জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল, একটা বালিগঞ্জে আর একটা শ্যামবাজারে। বালিগঞ্জের জন্যে দু'খানা বই আর শ্যামবাজারের জন্যে একখানা শাড়ি কিনেছিলাম। দুবগলে দুটি প্রেজেন্ট নিয়ে কোনোরকমে বাসে ওঠা গেল। কিন্তু হাত তুলে হ্যান্ডেল ধরা গেল না। তবে ব্যূহের মধ্যে টলটলায়মান হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছিলাম ঠিকই। কিন্তু নামতে আর পারিনে। শেষে ধস্তাধস্তি করে হ্যাণ্ডেল ধরে নামতে গিয়ে বগলদাবা-জিনিস দুটো কাদের পায়ের তলায় গেল পিষে। আর আমি যখন রাস্তায় নামলাম তখন দেখি আমার কোঁচানো ধুতিখানাও বাসে রয়ে গেচে। গায়ে শুধু পাঞ্জাবি পরণে আণ্ডারওয়ার!

তবু রক্ষে, নেমে দেখি সামনেই ফুটপাথে একটা গামছার দোকান। তাড়াতাড়ি একখানা গামছা কিনে কোমরে জড়িয়ে সোজা হেঁটে চলে এলাম বাড়ি।

বাড়িতে চিঁড়ে ছিল, তাই রাত-উপোসটা আর করতে হলো না। তবে বাসে চিড়ে-চ্যাপ্টা হওয়ায় গায়ের ব্যথা ছিল পুরো তিনদিন।

আচ্ছা, বিয়ের ঐ নিমন্ত্রণ পত্রগুলো বিজয়া বা দেওয়ালীর গ্রিটিংস কার্ডের মতো হয় না কেন? ওগুলি কেমন নিরীহ আর মিষ্টি।

আমি আর কাকটা

আমি জানলার কাছে বসে লিখছিলাম।

একটা কাক এসে জানলাটার খোলা পাল্লায় এসে বসলো, আর কেবল কা-কা করতে লাগলো।

যেন বলতে লাগলো—কা-কা, কি-কি, কি খবর?

কলম রেখে মুখ তুলে বললাম, কী আর খবর! দিন-দিন অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছি। দিন চলা দায় হয়ে উঠচে।— হঠাৎ কী খেয়াল হলো বললাম, তোমরা বেশ ভালই আছো। ভাবনা নেই চিন্তা নেই—

—নেইই তো।—কাকটা বললো, আমাদের ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। ব্লাড প্রেসার নেই, ডায়বিটিস নেই। বাড়ির ট্যাক্স নেই, ইনকাম ট্যাক্স নেই, সেলস ট্যাক্স নেই, প্রফেশনাল ট্যাক্স নেই।— আমরা কারোর কর-কবলিত নই।

আমাদের ব্যবসা নেই, চাকরি নেই, ব্যাংকে ফিক্সড-ডিপোজিট নেই, ইউনিট-ট্রাস্ট নেই, লাইফ-ইনসিওরেন্স নেই।—আমাদের ভাণ্ডার আছে ভরে তোমা সবাকার ঘরে-ঘরে।

আমাদের জন্যে ডাক্তার নেই, কোবরেজ নেই, হাসপাতাল নেই, নার্সিংহোম নেই। আমাদের স্কুল-কলেজ নেই, পরীক্ষা নেই, টোকাটুকি নেই।—ওসব আমরা থোড়াই কেয়ার করি।

আমাদের লোডশেডিং-এর কষ্ট নেই, বাসে ঝোলার কষ্ট নেই, কোমরে ব্যথার কষ্ট নেই, ইনসমনিয়ার কষ্ট নেই—মানে, কোনো কষ্টই নেই। আমরাই প্রকৃত কেষ্টর জীব।

আমরা যখন ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে উড়ে যাই, জুড়ে বসি। কোথাও যেতে একমাস আগে সীট রিজার্ভ করিনে, টাইমটেবিল দেখিনে, হোটেল রিজার্ভ করিনে।—আমরা স্বাধীন ট্যুরিস্ট।

হ্যাঁ, ট্যুরিস্ট। দেখো না প্রতি বছরে পক্ষীবংশীয়রা সেই সুদূর মানস-সরোবর থেকে সোজা চলে আসে তোমাদের আলিপুরের চিড়িয়াখানায় (যদিও সেখানে চিড়িয়া ছাড়াও বাঘ,ভাল্লুকও ঢুকিয়েচো)—তবু তারা আসে হাজার হাজার মাইল উড়ে, কোনো কম্পাস ম্যাপ বা গাইড-বইয়ের তোয়াক্কা না করেই। কী করে আসে, তোমরা মনুষ্যকুল তার কুল-কিনারা পাওনি আজও। বুঝলে?—খ্যা-খ্যা-খ্যা।

বলেই কাকটা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বুঝি হাসতে লাগলো ঠোঁট দুটো ফাঁক করে।

আমি বললাম, তা তোমরা তো ভালই আছো, হে শ্রীকাক-সুন্দর।

—আছিই তো।—কাকটা বললো: বাজারে জিনিসের দাম বাড়চে, আমরা কিন্তু বাজারে মাছ-মাংস সব কিছুই প্রতিদিনই খাই আর বিনে পয়সায়। তোমাদের বাড়ি-ভাড়া বাড়চে আমাদের কাকের-বাসার দাম মোটেই বাড়েনি। আমাদের বাসার জন্যে তো আর ইঁট সিমেন্ট দরকার হয় না, ঘুস দিয়ে প্ল্যান পাস করাতেও হয় না। আমাদের বাসায় কোকিলের ডিমও আশ্রয় পায়, যদিও আমাদের অজ্ঞাতে, তবুও আমরা মহান!

তোমাদের কত কি দরকার হয়, আমাদের হয় না। তোমাদের রেশনের দরকার, ফ্যাশনের দরকার, মোশনের পারগেটিভ দরকার, টুথপেষ্ট দরকার, স্নো ক্রীম সেণ্ট সাবান দরকার, বেবিফুড দরকার, কয়লা কেরোসিন ঘুটে দরকার, ইনডেন-গ্যাস দরকার, ইলেকট্রিক হিটার দরকার, রেডিও, ষ্টিরিয়ো, টেলিফোন, টি-ভি, রেফ্রিজারেটার—কত কি দরকার! আমাদের ওসব কিছুই দরকার হয় না। তোমরা সব 'দরকার' নিজেরাই তৈরী করচো, আর তার অভাবে মরচো। তোমরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মেরেচো। তোমাদের বিজ্ঞানীরা অজ্ঞানী। তাই তোমাদের হাল্কা করতে পারেনি, ভারি-ই করেচে। তোমরা সেই ভারে ডুবে মরচো।

তোমরা মরচো প্রেমিকার মান ভাঙাতে, মেয়েকে সম্প্রদান করতে। মরচো গিন্নীর গাল খেয়ে, ভেজাল মাল খেয়ে, পচা চাল খেয়ে। তোমরা বেঁচে নেই, মরেচো, মরচো।

স্বীকার করলাম—তা মরচি বটে!

কাকটা বললো, দেখো আমাদের একটা বদনাম আছে, আমরা ফাঁক পেলেই

গৃহস্থের বাটিটা গেলাসটা চুরি করি। স্বীকার করি। কিন্তু তোমরা হচ্চো চোরের বাবা, বাটপাড়ের বাবাও। তোমরা পুকুর চুরি করো। ননীচোরা কৃষ্ণের যোগ্য ভক্ত তোমরা।

কাকটা বললো, তোমাদের 'মানবজন্ম সার্থক' কথাটা মন-গড়া। তোমাদের চণ্ডিদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' কথাটা ডাহা মিথ্যে—। তা যদি হতো তাহলে তোমরা উঠেপড়ে মানুষ-জন্ম কমাবার জন্যে ফ্যামিলি-প্ল্যানিং করতে না। তাই আমি মনে করি আমাদের পক্ষী-কুলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানোই তোমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমার এই 'পক্ষপাতিত্ব' কথাটা থেকেই মনে পড়ে গেল—তোমাদের রাজনীতিক নেতাদের কথা। তাঁরা তো দেখচি ঐ 'পক্ষপাতিত্ব' কথাটার উপর খুব জোর দিয়েচেন। একদিন এর পক্ষে আর একদিন ওর পক্ষে গিয়ে পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্চেন। আর নেতারা পক্ষ-বিস্তার করে ভক্তদের আশ্রয় দিচ্চেন। কেবল দল, দল, আর দলাই-মলাই।

জিগ্যেস করলাম, হে শ্রীকাক-স্বামী, তুমি এত কথা সব জানলে কোথায়?

—কোথায় আবার! রেডিয়োতে শুনে।—কাকটা বললো, তবে টিভি-টা সন্ধ্যায় হয় আর ঘরের মধ্যে হয় বলে দেখতে বা শুনতে পাইনে। তখন বাসায় গিয়ে ঘুমোই। Early to bed early to rise, makes a crow healthy & wise. Wealthy কথাটা এখানে বাদ দিলাম। তবে health যদি wealth হয়—তবে আমরা wealthy-ও বটেক। কোন্ কাক-ভোরে আমরাই তো কা-কা ডেকে তোমাদের ঘুম ভাঙাই। তোমাদের বিনা পয়সার এলার্ম-ঘড়ি।

যাকগে, একটা কথা বলি। তোমাদের একটা কথা আছে না—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। It is very very insulting to crow-nation. তোমাদের পেটেই এখন ভাত নেই, ছড়াবে কি? আর কাককে তোমাদের মত তু করে ডাকলেই আসে না। কাক ইজ কাক—কাকার চাইতেও প্রণম্য, বাবার চাইতেও। কিংবা কাকার বা বাবার বাবার চাইতেও! অবশ্য পক্ষীতীর্থে একজোড়া পক্ষীকে তোমরা সম্মান দেখাও বটে। এনি হাউ, তোমরা তোমাদের ঐ 'ভাত-ছড়ালে কাকের অভাব' প্রবাদটি তোমাদের পাঠ্য-পুস্তক থেকে উঠিয়ে দেবে।—নইলে তোমাদের ছাত্রদের মাথায় যেটুকু ঘেলু আছে, তা ঠুকরে বার করে দেবো।

অবশ্য স্বীকার করচি, কাককে তোমাদের বাংলা ভাষায় ফাঁক দাওনি,

কাক-ভোর, কাক-চক্ষু, কাক-জোৎস্না, কাক-স্নান, কাক-ভুষুণ্ডি, কাক-তাড়ুয়া, কাক-তালীয়, ঝোড়োকাক ইত্যাদি কথাগুলো আছে শুনেচি। সাহিত্যেও সুকুমার রায় কাকেশ্বরকে স্থান দিয়েচেন। 'কাকস্য পরিবেদনা' কথাটাও সংস্কৃতে আছে। কেউ মরে গেলে তার উদ্দেশ্যে কাক-দুধও দাও দেখেচি, খেয়েচিও সেই দুধকলা। ভালোই খেতে।

আর তোমাদের ধন্যবাদ দিই, তোমরা আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে চাওনি। খাঁচায় ধরে রাখোনি। তবে এ ব্যাপারে অন্যান্য পক্ষীকুলের হয়ে আমরা বিক্ষোভ জানাবো ঠিক করেচি। শুনেচি হিচকক সাহেব 'দি বার্ড্‌স' বলে একটি ছবি তুলেচেন, তাতে দেখিয়েচেন পাখীরাও কী ভয়ানক হতে পারে। হিচকক সাহেবকে সেলাম। তাঁর যেন কখনও হেঁচকি না ওঠে।

আরো তোমাদের ধন্যবাদ, তোমরা কাকের মাংস খাও না, কাকের ডিম খাও না, ঘোড়ার-ডিম বলে কাকের ডিমকে গালাগালি দাও না। তবে ঐ এক কথা—মুরগী খাও, তার ডিম খাও, হাঁস আর হাঁসের ডিম খাও, পায়রা খাও, টার্কি ফাউল খাও— তোমরা রাক্ষস। তোমরা বোধ হয় আকাশের উড়োজাহাজ জলের ডুবোজাহাজ আর স্থলের মোটরগাড়ি খেতে পারো না, তাই খাও না। সাবধান, ঐ সব পক্ষী-মাংস ছাড়ো। বরং পাঁঠা খাও, পাঁঠার মত বুদ্ধি হোক তোমাদের, হয়েচেও। আর ছাগ-সাহিত্যেরও সমৃদ্ধি হোক তোমাদের।

হ্যাঁ, তোমরা ছাগ-ছাইত্ব মানে অশ্লীল যৌনসাহিত্য পড়তেই ভালোবাসো। সিনেমা থিয়েটারে ক্যাবারে নাচ না হলে চলে না। কিন্তু আমরা? আমরা নগ্ন বটে, তাছাড়া অভ্যেসের দোষে ছাদ-ছাড়া বাথরুমে মেয়ে বা পুরুষের স্নানও উঁকি মেরে দেখি বটে, তবু আমরা ভব্য-সভ্য অন্তত যৌন ব্যাপারে। বলি, কত তো পশুপাখীর যৌন আচরণ দেখো পথে ঘাটে যেখানে-সেখানে, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো কাক-বংশীয় কাউকে অমন প্রকাশ্যে অসভ্যতা করতে দেখেচো কখনো? অথচ আমরাও সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকি।

কাকটার কথাগুলো শুনতে-শুনতে মনটা কেমন যেন ককিয়ে উঠলো। সত্যিই তো, আমরা কি? কাকের কাছে আমরা কেন্নো যেন। আমার কান্না পেয়ে গেল।

আমি বললাম, হে সর্বত্যাগী কাক-তপস্বী। তুমিই হয়তো সেই কৈকেয়ী

পুত্র শ্রীরাম-ভক্ত ভরত। তোমার নামেই হয়তো এই ভারত। হে ভারত-ভর্তা শ্রীকাক-চতুর। আমরা আগামী ইলেকসনে তোমাকে ভারতের শ্রী-ন্যাশন্যাল-পক্ষীর শ্রীআসনের ব্যবস্থা করবো। বিশেষ করে বর্তমানে ন্যাশন্যাল-পক্ষী 'ময়ূর' তোমাদের একদা .অপমান করেছিলো। হে শ্রীকাক-কালো-কুচকুচে, তুমি আমাদের এই সংসারের পাঁক থেকে রক্ষা করো। অবশ্য রাস্তায় মরা ইঁদুর আর আবর্জনা খেয়ে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করচোই।

হে শ্রীকাক-চঞ্চল, এসো, তোমাকে আমার কাঁকে করে নাচাই। মাথায় তুলে নাচাবো না, পাছে মাথায় তুমি পুরীষ পরিত্যাগ করো।

তা সে সাহস তোমার আছে। তুমি তো প্রতিদিন স্যার আশুতোষ, বিদ্যাসাগর, প্রফুল্লচন্দ্র, নেতাজী প্রভৃতি মহাপুরুষদের মাথায় পুরীষ পরিত্যাগ করো। তার পূর্বে ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সম্রাট পঞ্চম জর্জ প্রভৃতি মহা-মহাশয়া-মহাশয়দের শ্রীমাথাতেও সপৌরুষে পুরীষ ত্যাগ করে সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েচো। আজও তোমার সেই পরম-পৌরুষ পুরোদমেই আছে।

হে পক্ষী-শ্রেষ্ঠ, হে সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, আমি যেন আগামী জন্মে কাক-জন্ম প্রাপ্ত হই।

সঙ্গে সঙ্গে কাকটা ঘাড় বেঁকিয়ে তার ডান পা-টা তুলে বললো, বৎস। আমি সেই আশীর্বাদই করচি। তুমি শ্রীঘ্রই মরো এবং কাকত্ব প্রাপ্ত হও। তবে সাবধান, তোমার এই নিকৃষ্ট মানুষ-জন্মে কাক সাজতে যেয়ো না। তাতে মান খোয়াবে। আমার সেই কাক ও ময়ূরপুচ্ছের ঘটনাটার কথা মনে রেখো। আমি নিজে ঐ কাজ করে মানুষকে ঐ শিক্ষাই দিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, আরো তোমাদের কয়েকটা শিক্ষা দিয়েছিলাম। শেয়ালের প্রশংসায় গান গাইতে গিয়ে ঠোঁটে-ধরা মাংস হারিয়ে বুঝিয়েছিলাম, কারোর মোসাহেবীতে ভুলো না। আর কলসীতে নুড়ি ফেলে ফেলে জল তুলে এনে খেয়ে দেখিয়েছিলাম, নেসেসিটি ইজ দি মাদার অব ইনভেনসন থিয়োরিটা। আচ্ছা গুডবাই, চলি, টা-টা।

তাড়াতাড়ি বললাম —হে শ্রীকাক-গুরু, তোমাকে প্রণাম করতে চাই।

—কিন্তু আমি তোমার হাতে ধরা পড়তে চাইনে!—কাকটা হেসে বললো,

অতি-ভক্তির প্রণামে দরকার নেই আমার। আমার নাম করো, আমার অষ্টোত্তর শতনাম তৈরী করো।

বললাম, আচ্ছা, তবে দূর থেকেই প্রণাম করচি।

এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াতেই শ্রীকাক-কঙ্কন তার পাখার ঝাপটা দিয়ে উড়ে গেল। যাবার সময় আর একবার শব্দ করলো, ক্যা-ক্যা!

হয়তো বললো, কেয়া বুদ্ধু হ্যায়।

কলকাতার বর্ষায়

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা, কুলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।'

কুলীন কলকাতার বর্ষায় সে কূলটুকুও নেই যে বসবো, একটু ভাববো, কি করা যায়। কোন ভরসা তো নেই-ই, বরং এমন অবস্থায় পড়তে হয় যে 'আঁখি সরসা' হবার উপক্রম!

তবে যাঁদের বাড়ি উঁচু পাড়ায়, বাড়িটাও উঁচু, তাঁরা উঁচু জাতের নাও হন যদি তাতে ক্ষতি নেই, সেদিন তাঁরা উঁচু মানের। তাঁদের কেউ কেউ যদি সেদিন পেটের তাগিদে বা কাজের তাগিদে বাইরে বেরিয়ে না থাকেন, তবে তাঁরা রীতিমত সৌভাগ্যবানও বটেন। ঘন বরষায় বিকেলে দিব্যি মুড়ি মাখিয়ে তেলেভাজা খাওয়া, এবং রাত্রে গরমাগরম খিচুড়ি আলুভাজা (মাছ আনতে কে যাবে?) আর সারাদিনটা জানলার ধারে বসে বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কলকাতার ভেনিস-নগরী দর্শন করা—যাকে বলে পূর্বজন্মের পুণ্যফল।

তা, কলকাতার বর্ষা সত্যিই দর্শনীয়। এবং সেই বরষায় রাস্তায় যাঁদের 'আঁখি সরসা' তাঁরাও কম দ্রষ্টব্য নন। আর যেসব ভাগ্যবান বা বতীরা দোতলার জানলা বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে সে দৃশ্য দেখতে পান, তাঁরা তো সেদিন যেন থিয়েটারের বিশ টাকার সামনের সীটে বসে একটা অতি-বিয়োগান্ত নাটক দেখার 'পুলক' অনুভব করলেন! পৌষমাস আর সর্বনাশের বহু বাস্তব উদাহরণ সেদিন এই কলকাতার জলীয় রাস্তায় ঘোলা আর নোংরা জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রবাহিত!

বৃষ্টিতে রাস্তায় পায়ের-পাতা-ডোবা-জল জমবার সঙ্গেসঙ্গেই ট্রামগুলি তাঁদের করুণাময় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাড়াতাড়ি ডিপোতে ঢুকে পড়লেন। যাঁরা পারলেন না, তাঁরা রাস্তার মাঝখানে লম্বালম্বি হয়ে পড়েপড়ে ভিজলেন।

এক বেঘত জল জমবার সঙ্গে-সঙ্গে ঢাউস সরকারী বাসগুলো কোথায় যে উধাও হয়ে গেলেন, কে জানে। হিন্দুস্থানী পুলিশগুলো মোষের চামড়ার বুট ভেজবার ভয়ে কোনো বাড়ির উঁচু রকে গিয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে চাড়া দিতে লাগলো। বাঙ্গালী মাত্রেই একটু বেপরোয়া, বাঙ্গালী পুলিশরা আরো বেশী। তাদের অনেকেই ঠিক করলো, চাকরি মাথায় থাক, খুলে ফ্যাল্ পট্টিজুতো। চাকরি গেলে চাকরি পাবো, প্রাণটা গেলে কেউ দেবে না! মুখ্যমন্ত্রীও না। অতএব দেখা গেল হাতে পট্টি ও বুট ঝুলিয়ে তারা অলি-গলিতে ঢুকলো!

ততক্ষণে রাস্তায় জলের লেভেল কড়াইয়ে দুধ উথলোবার মতই ঊর্ধ্বগামী। ফুটপাথ ডুবলো, বাড়ির একটা-দুটো করে সিঁড়ি ডুবলো, সামনের বাড়ির রক ডুবলো এবং শেষপর্যন্ত রাস্তার জলের কল আর জলের টিউবওয়েলগুলোও অমন জল দেখে জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে বসে রইলো।

এবং তারপর যা হলো, তা বৈষ্ণব কবির ভাষায় 'ঘর করিনু বাহির, বাহির করিনু ঘর।' সদর অন্দর একাকার। নীচের ড্রেনের জল উঠে এলো সদর রাস্তায়, সদর রাস্তার জল ঢুকলো এসে শোবার ঘরে, রান্নাঘরে। পায়খানার 'ময়লা' জল আর রান্নাঘরের কয়লা-ঘুঁটে, হাড়ি-কড়াই হাতা-খুন্তিতে দেখা গেল কেমন দিব্যি একটা মাখামাখি ভাব! সর্বত্রই একটা ফ্রী-অ্যাডমিশন গোছের আবহাওয়া। নো-অ্যাডমিশন বা ফ্রী-পাশ বন্ধ কথাগুলো এদিন অচল। এমত অবস্থায় যেসব গৃহস্থরা উদার মতাবলম্বী তাঁরা শোবার ঘরের চৌকির উপরে বাক্স-বিছানা উঠিয়ে তার উপর বসে নির্বিকার চিত্তে 'শ্রীক্ষেত্র' দর্শন করতে লাগলেন। ছাত্ররা নতুন ঘরোয়া ভূগোল পাঠে মন দিলো: চৌকিটুকুই স্থল আর সবই জল। ব্রহ্মবাদীরা নতুন দর্শন আবিস্কার করলেন: ব্রহ্মাণ্ড জলাকার। ওদিকে মৌলালীর খৃষ্টানরা ডাইনিং টেবিলের উপর চেয়ার পেতে তাতে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন: এই কি বিংশ শতাব্দীর নোয়ার আর্ক? আর হিন্দুধর্মে ছুৎমার্গে বিশ্বাসী ঠাকুমা-দিদিমারা দড়ি হাতে হয়তো ঘরের কড়ি-কাঠের আংটা খুঁজতে লাগলেন, যদি ঝুলে থাকা যায় ততক্ষণ, অন্তত এই 'নিঘিন্যে' জলের ছোঁয়া থেকে গা-পা সব বাঁচানো যাবে তবু!

বাইরে রাস্তার অবস্থা ততোধিক জলীয়। স্কুল-ফেরা ছেলেরা প্রায় সাঁতার কাটচে। বই খাতাও। ছোট মেয়েরা প্রায়ই স্কুলে বন্দিনী। তবে কোনো

কোনো বাড়ির ঢ্যাঙা চাকর তাদের বাচ্চা দিদিমণির সুটকেশ একহাতে আর অন্যহাতে দিদিমণির বাঁধা-দুই-বিনুনি ঐ সুটকেশের হাতলের মতই উঁচু করে ধ'রে (যাতে নাকটুকু জলের বাইরে থাকে !) কোন রকমে ভাসিয়ে নিয়ে আসচে বাড়ির দিকে ! মেজদিদিমণিরাও বই-খাতা ও জুতো বরণডালার মত উঁচিয়ে ধরে জল ঠেলে-ঠেলে চলেচেন। আর ফোক্কড় ছোঁড়াগুলো কোনো খালের ('পথে'র আর বলি কি ক'রে ?) মোড়ে দাঁড়িয়ে গাইচে ঃ 'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভেজাবো না।' বড়দিদিমণিরা এক হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, অন্য হাতে স্যাণ্ডেল সহ ভারাক্রান্ত দেহ ও মন নিয়ে এগিয়ে চলেচেন জলপথে, যেন, 'আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে, ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে —।' এঁদের মধ্যে যাঁরা 'পতিব্রতা', তাঁরা হয়তো কর্তার চা-য়ের জন্যে ব্যাকুল। আর খোকনা বা খুকুনির মা'দের চোখগুলো ততক্ষণে ছলছল ঃ ছেলেমেয়েগুলো এতক্ষণে কি করচে, কে জানে !

অথচ তাড়াতাড়ি এগুবারও উপায় নেই। ট্রাম নেই, বাস নেই—সব উধাও। ট্যাক্সি নেই, বেশির ভাগই জলে দেহের কালিমাটুকু ডুবিয়ে রেখে সাদা পাকা মাথাটুকু বার করে আছে 'খালে'র এখানে-ওখানে। আর বাকী সব শোয়ারী ভর্তি। তেমনি ছোট-ছোট প্রাইভেট কারগুলো জলে নাক ডোবানো। গাড়ির চালকরা গাড়ির ছাদে বা বনেটে অবস্থিত। একটু বড় মোটরকারগুলোর পেছনের ধোঁয়া-নলের ধোঁয়া জলের মধ্যে বগ্‌বগ্‌ করচে, যেন মোটর লঞ্চ ! লরিগুলো ষ্টীমার ! জলে ঢেউয়ের দোলা দিয়ে দিয়ে এগুচ্চে। খালি ও খোলা লরিতে বিনা টিকিটের ভিজে প্যাসেঞ্জার ভর্তি। রিক্সার ভাড়া এদিন প্রতি একশ গজ পাঁচ টাকা এবং ঠেলাগাড়ির প্যাসেঞ্জারদের ভাড়া দু'টাকা করে প্রতি মাথা ! ডালহৌসী টু ঢাকুরে, সখেরবাজার কিংবা নাগেরবাজার, এড়েদা যাওয়া শ্রীচরণদ্বয়ের সাধ্যাতীত ব্যাপার। তার উপর পায়ে-পায়ে জলরাশির জাজ্বল্যমান তামাসা ঃ দেহি পদপল্লবমুদারম্‌ ! কাজেই বেলা পাঁচটায় যাঁর ঘরে ঢোকবার কথা, রাত বারোটাতেও তিনি ঘরছাড়া। আর ঘরনীদের ঘরের মধ্যেই ঘোরাঘুরি সার ! কিংকর্তব্যবিমূঢ়া।

আবার মওকা যাঁরা খোঁজেন, তাঁরা রেশনের থলে হাতে বাজার-মুখো। যদি সস্তায় ইলিশমাছটা বা তরি-তরকারি হাতানো যায় ! মোটরগাড়ি ঠেলে দু'পয়সা কামাবার জন্যে বিড়ি-কানে ছোকরাদের হুড়োহুড়ি ! মোড়ে ট্রাফিক-পুলিশের জায়গায় পাড়ার বেকারদের মোটরকার তদারকী ! সবাই যে-যার

তালে ব্যস্ত। ওদিকে দোকানদাররা উদ্‌ব্যস্ত চালের বস্তা, ময়দার বস্তা সরাতে, কাপড়ের দোকানে কাপড়ের গাঁট সরাতে ব্যস্ত দোকানী, প্রেস-মালিকরা খদ্দেরের রিম-রিম কাগজ নিয়ে নাজেহাল, দপ্তরী ফর্মা বাঁচাতে অস্থির।

কলকাতার সার্কুলার রোডের একটা স্থান আছে, যেখানে সহজে জল জমে না। কিন্তু রাত দশটাতেও এদিন সেখানে হাঁটুজল। মোটরগাড়ি আর মানুষের ঠেলাঠেলি, একটু কম জলে আসবার বাসনা। তাই অত রাত্রেও রাস্তাটা লোকারণ্য। যেন মেলা।

কিন্তু কলেজ স্ট্রীট? অমন জমজমাট রাস্তাটা যেন স্রেফ প্রেতপুরী: গাঁয়ের একফালি খাল! ঘুটঘুটে অন্ধকার। নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ। লোক নেই, জন নেই, গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই। দুধারে বাড়ি-বাঁধানো লম্টাটে একটা একটানা খাল। আর ঐ যে ইউনিভার্সিটি, প্রেসিডেন্সি কলেজ, বইয়ের দোকানগুলো। অন্ধকারে জলে প্রায় গলা ডুবিয়ে বসে আছেন বিদ্যাসাগর, দাঁড়িয়ে প্রফুল্লচন্দ্র!

হাতের ডুবন্ত সাইকেলখানা বুক-জলে ঠেলতে ঠেলতে এগুচ্চি, দুপাশ দিয়ে ভেসে যাচ্চে হাঁড়ি, কলসী, তোষক, বালিশ, ঝুড়ি, জুতো, বই, কাগজ ইত্যাদি!

হঠাৎ পায়ে যেন ঠেকলো কী! কলেজ স্কোয়ারের রুই কিংবা কাতলা ভেসে এলো নাকি? একেই বলে ভাগ্য! কিন্তু পায়ে জড়িয়ে গেল জিনিসটা! তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে দেখি একটা মরা কুকুরের ঠ্যাং চারটে আমার ঠ্যাংকে আঁকড়ে ধরেচে। বাঁচতে? ইস! যেন বলচে, পারলে না আমাকে বাঁচাতে? আমিও তো তোমাদের মহানগরীর একজন নাগরিক!

মরা কুকুরটার ঠ্যাং চতুষ্টয় থেকে নিজের ঠ্যাংকে মুক্ত করে নিয়ে ভাবলাম, সত্যিই তো, আমাদের এই প্রতিবেশীদের কথা তো এতক্ষণ মনেই পড়েনি।

আবার এগোতে লাগলাম। পায়ে খোয়া বিঁধতে লাগলো। তবে গর্তে পা পড়বার ভয় নেই, এই যা! কারণ পথের হাইড্রেনের মুখগুলো তখনো খোলা হয়নি।

শেয়ার বাজার ঃ কান্নাহাসির হাট

আগেই বলে রাখি -শেয়ার বাজারের সঙ্গে শেয়ালদা বাজারের বা অন্য কোন বাজারের কোনই মিল নেই।

শেয়ার বাজারে এক ধরণের অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়—যার ভাবটা হচ্চে ঃ কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া ?—হুয়া, হুয়া, নেহি হুয়া।

অন্য বাজারের মত এই শেয়ার বাজারে নগদ টাকার লেনদেন সবসময়ে হয় না বটে, তবে চটপট যুক্তি করে যে চুক্তি করা হয়, তাতে থাকে আশ্বাস আর বিশ্বাস। সে চুক্তি থেকে মুক্তি পাওয়াও সহজ নয়।

কলকাতার শেয়ার বাজার বা Stock Exchange-এর পাশ দিয়ে বা কাছ দিয়ে গেছেন কখনো ? ঐ যে ডালহোসী স্কোয়ারে সরকারী দপ্তরখানা রাইটার্স বিল্ডিং, তারই পেছনের রাস্তাটা, যার আগে নাম ছিল Royal Exchange Place, আর এখন নাম হয়েচে India Exchange Place, সেই রাস্তায় মোড়ের উপর বিরাট বাড়িটা।

আমি তো মশায়, প্রথম যেদিন ঐ রাস্তা দিয়ে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কানে এলো, ঐ বিরাট বাড়িটা থেকে যেন হাজার হাজার লোকের গোলমাল।

শুনে ঘাবড়ে গেলাম। ভেতরে মারামারি হচ্চে নাকি ? থমকে থেমে গিয়ে শুকনো গলায় বন্ধুকে জিগ্যেস করলাম—হ্যাঁরে, ব্যাপার কি ?

বন্ধু হেসে বললো, ঘাবড়াও মাৎ। ওটা Stock Exchange.

বললাম, তাই কি যার যত গালাগালির stock আছে, ভেতরে তারই exchange চলচে ?

—নারে! বন্ধু বোঝালো ঃ বড় বড় কোম্পানীর stock বা শেয়ার কেনা-বেচা চলচে। কোন কোন কোম্পানীর শেয়ারের দাম কমে গেলেই

অনেকেই তা কিনে রাখচে, আবার কোন কোম্পানীর শেয়ারের দাম বাড়লেই, তা বিক্রী করচে। এইভাবে চলচে লাখ-লাখ টাকার কেনা-বেচা। তাতে যার luck ভাল, সে লাভ করচে, আর যার পোড়া-কপাল সে হায়-হায় করচে।

—তাই বল্ ! এতক্ষণে যেন বুঝলাম ঃ বাড়িটায় হায়-হায় আর হৈ-হৈ চলচে, তাই এত হৈ-হল্লা।

—অনেকটা তাই ! বন্ধু জানালো, তবে এটাও ঠিক, আজ যার কপাল ভালো, কাল তার কপালে হয়তো ছাই জুটবে। আবার আজ যার পোড়া-কপাল কাল তার কপালে হয়তো ফলবে সোনা !

শুনে বললাম, তা, শেয়ারের দর অত ওটা-নামাই বা করে কেন ?

এবার ধমক দিলো বন্ধু ঃ এ সংসারে কোনো কিছু এক ভাবে থাকে ? গঙ্গায় জল ওঠা-নামা করে কেন ? আকাশে চাঁদ বাড়ে-কমে কেন ? চালের দর, তেলের দর এক থাকে দেখেছিস ? বাজারে মাছের দর ওঠা-নামা করে না ? এ-ও একরকম মেছো-বাজার। শুনছিসনে মেছোবাজারের মত গোলমাল ?

—যা বলেচিস্ ! এতক্ষণে মনের মত একটা কথা পেলাম শুনতে !

বন্ধু বললো, গঙ্গা বা চাঁদের ওঠা-নামার কথা ছেড়ে দে। ওসব হচ্চে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। তবে বাজারে ওঠা-নামা-র কথা তো জানিস ! বাজারে বেশি মাল এলে তার দাম কমে যায়, আর কম এলে চাহিদা যায় বেড়ে, আর সেই সঙ্গে দরও। Demand and Supply-এর ব্যাপার। তাছাড়া ভালো ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ দেয় এমন কোম্পানীর শেয়ারের চাহিদা তো থাকেই। দুধওয়ালা গরু কে না চায় ?

সামনে অপর ফুটপাতে একটা পুরনো বাড়ির দেড়তলার বাইরের দেওয়ালে দেখি অদ্ভুত ধরণের পাশাপাশি আর উপর-নীচে অনেকগুলো পায়রার খোপ। এক-একটা খোপে দু'তিনজন করে লোক বসে। তারা কানে টেলিফোন লাগিয়ে শেয়ারের সেদিনকার বাজার-দর জানচে, আর হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে, হাঁক দিয়ে-দিয়ে কথা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে জানাচ্চে ঃ তেজী-মন্দা তেজী-মন্দা !

সে দৃশ্য মন্দ নয় দেখতে। রাস্তায় দাঁড়ানো লোকগুলিও খোপে-বসা লোকেদের জবাবে হাত ছুঁড়চে, দর নোট করচে খাতায়।

—ওদের কার্টান বলে। শেয়ার কাটায় কিনা !—বন্ধু বুঝিয়ে দিলো ঃ

ঐ যে পায়রার খোপ দেখচিস, ওর মধ্যে পায়রায় ডিম পাড়ে কিনা জানিনে, তবে হরদম সেই রাজহাঁসটা ডিম পাড়চে, সোনার ডিম। ঐ এক-একটি খোপ থেকে টোপ ফেলা হচ্চে আর সবাই সেইমত ঝোপ বুঝে কোপ মারচে!

দেখলাম, কেউ-কেউ অতি উৎসাহে পার্ক করা গাড়ির ইঞ্জিনের উপর উঠে বসেচে। গাড়ি চলার পথ প্রায় বন্ধ। অথচ দণ্ড হাতে দণ্ডায়মান পুলিশের কোন দেখা নেই। হয়তো, ব্যাপারটা তারও আওতার বাইরে। বরং চারধারে খাবারের ফেরিওয়ালার ভিড়। অর্থাৎ রাস্তাটায় খবর আর খাবারই চালু।

বন্ধু বললো, এসব যা দেখলি, সবই বাইরের ব্যাপার। কালিঘাটের মন্দিরের বাইরে যেন পাণ্ডার দল। চলু Stock Exchange-এর ভেতর যাই।

গেলাম।

বিরাট হল। এয়ার-কণ্ডিশনড করা। ভেতরে ঘোরানো বারান্দা। লোক গিজগিজ করচে। আর গোলমাল। দূর থেকে কারোর কথা বোঝা যাচ্চে না। সত্যিই যেন মেছোবাজার। অথচ হল-এ বড়-বড় জানলা, দেওয়ালে বড় একটা ঘড়ি। তাছাড়া বাজারদরের বোর্ড, নোটিশ বোর্ড ইত্যাদি। মাঝে-মাঝে বেঞ্চি পাতা, প্ল্যাটফর্ম পাতা। রীতিমতো সাজানো-গোছানো ব্যাপার।

আমরা এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বন্ধু বললো, কলকাতার এই শেয়ার বাজারটাই ভারতের মধ্যে সব চাইতে পুরনো আর বড়। প্রথম দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঋণপত্রও এখানে কেনা-বেচা চলতো। পরে কাছেই নিউ চীনাবাজার ষ্ট্রীটে এই শেয়ার-বাজার চলতে থাকে। শেষে এখানে প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ করে এই বাড়ি তৈরী হয় এবং শেয়ার কারবারীরা এই সমিতিকে 'লিমিটেড কোম্পানী'র রূপ দেন। নাম হয় Calcutta Stock Exchange Association Ltd.

বন্ধু বললো, এই হল-এ যাঁদের দেখচিস, এঁরা কেউ আজেবাজে লোক নন। সব রেজিষ্টার্ড ব্রোকার বা দালাল এবং এই শেয়ার বাজারের সভ্য। এঁদের মধ্যে আছেন Bull বা তেজীওয়ালা, Bear বা মন্দীওয়ালা, Stag বা অধিকমূল্য শিকারী, Lame Duck বা খেলাপী মন্দীওয়ালা প্রভৃতি। আর চলচে শেয়ারের ভবিষ্যৎ সরবরাহ বা Forward Delivery, আগাম কেনা-বেচা

মানে, Forward Contract, নগদ কেনা-বেচা বা Spot Dealings. তাছাড়া Arbitrage বা Hedging—মানে পণ্যচালানী কারবার বা আত্মরক্ষার ফটকাও চলে।

হঠাৎ থেমে বন্ধু বললো, নে চল্‌। এসব ফট করে বোঝবার জিনিস নয়। এই শেয়ার মার্কেটে সারাজীবন জুতো খইয়েও সহজে এর নাড়ি বোঝা যায় না। তাই অনেকে দুধ খেতে গিয়ে ঘোল্‌ খেয়ে যায়। যেন স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্‌।··· অথচ রহস্যময়ী নারীজাতি, যাদের নাড়ি বোঝা দায়—তাঁরা আর সব বাজারে কেনা-কাটা করেন, কিন্তু এই শেয়ারবাজারে তাঁদের টিকি, বেণী বা খোঁপা কিছুই দেখা যায় না।

হেসে বললাম, তা ঠিক।

বেরুবার সময় হঠাৎ নজরে পড়লো, এক ভদ্রলোক গালে হাত দিয়ে চুপ করে বেঞ্চে বসে আছেন। কাঁদিচেন নাকি ?

—হতে পারে। বন্ধু হেসে বললো ঃ এ দেখে দুঃখু করবার কিছু নেই। আজ ভদ্রলোক গালে হাত দিয়ে কাঁদিচেন বটে, কাল এলে দেখবি, উনিই হয়তো আনন্দে গাল বাজাচ্চেন আর লাফাচ্চেন। আর ঐ যে ভদ্রলোক খুব লাফাচ্ছিলেন দেখলি, তাঁকে দেখবি হয়তো একদম বসে পড়েচেন—প্রায় গাছতলায় বসার মতই।

শুনে হেসে বললাম ঃ এ তাহলে কান্না-হাসির হাট !

পু=পিং পং-এর বল

পুং হচ্চে মেয়েদের পিংপং খেলার বল।

মেয়েদের হাতের ঠোক্কর খেলে তবেই পুরুষরা লাফিয়ে ওঠে আর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে, বাধার জাল পার হয়ে যায় পাড়ি-মরি করে। আর মেয়েদের কঠিন-হাতের নরম ছোঁয়াচ না হলে পুরুষের জীবনটাই হয় শূন্য। ঐ সাদা বলটার মতই গোলাকার শূন্য।

এই রহস্যময় তত্ত্বটা তৎকালীন আদি যুগ থেকে এতৎকালীন মেয়েরা তাঁদের জন্ম থেকে জানেন বলেই—মহাশক্তির কলকাঠিটা তাঁদের হাতেই। জাগতিক পিং পং খেলায় মেয়েরা তাই অবহেলায় পুরুষদের খেলায় আর খেলায়। নইলে লতেব মেয়েও দেখি ডাম্বেল-তোলা পালোয়ান পুরুষকে কেমন দুর্বল আর বোম্-ভোলা করে দেয়! কী করে?

কাজেই ঐ যে কথা উঠেচে womens Lib চাই। ওটা মেয়েদেরই সেই পুরোন বায়নার আধুনিক রূপ। আসলে চাই Mens' Lib বা পুং-স্বাধীনতা। আর একটা কথা শোনা যায়, আগে নাকি পুরুষ-শাসিত সমাজ থাকায় নারীর উপর অন্যায় অত্যাচার চলেচে। আসলে কথাটা কিন্তু 'পুরুষ-শোষিত'। পুরুষ সে সময় নারীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই উঠে-পড়ে নারীকে ঘরে বন্দিনী করবার চেষ্টা করেছিলো। আত্মরক্ষার উপায়।

পুরাণে আমাদের দেব-দেবীদের পুরোন কথাই ধরা যাক না কেন? ভোলাবাবার বুকে উপরে উঠে দাঁড়ালেন মা কালী। অবশ্য জিব কাটলেন। সেটা চক্ষু লজ্জায়। ঐ বাবাকেই দাঁড়াতে হলো মা অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষে-পাত্র নিয়ে। কারণ মায়ের হাতেই ভাঁড়ারের চাবিকাঠি।

অত্যাচারী মহিষাসুরকে ঘায়েল করতে দেবী দুর্গার কাছেই শক্তিধর দেবতাদের ধর্ণা। ফাইনান্স ও এডুকেশন পোর্টফোলিও মা লক্ষ্মী মা সরস্বতীর আওতায়। সেখানে কুবের বা ব্যাসদেবের স্থান নেই।

শ্রীরাম তো একলাই বনে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সীতা নাছোড়বান্দা (ঠিককথায় নাছোড়বান্দী)। ভাবলেন পথে অপ্সরা-কিন্নরীরা ঘুরচে, কাজেই সঙ্গে থাকাই ভালো। তাঁর ঐ জেদের জন্যেই রামায়ণের তুলকালাম কান্ড!

যম রাজার মত তুখড় রাজাকেও কেমন জব্দ করেছিলেন ঐ সাবিত্রী। তাঁর নাকিকান্না আর বায়নায় বিরক্ত হয়ে শতপুত্রের জননী হবার বর দেবার কথা দিতেই ফোঁস করে সাবিত্রী নিজরূপ ধরলেন —তাহলে স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। ইয়ার্কি! বিধবার একটামাত্র ছেলে হলে পাড়াময় ঢি-ঢি পড়ে যায়, আর আমার একশো পুত্র! দাও ফিরিয়ে স্বামীকে। নারীর প্যাঁচে পড়ে আর এগোতে পিছোতে পারলেন না যমরাজা। জ্যামে পড়ে গেলেন।

কেন, শকুন্তলা? আশ্রমের সরলা বালিকা হলে কী হয়! রাজা দুষ্মন্তের দুষ্কর্মের জন্যে ছেড়ে কথা বললেন না। তাঁর রাজদরবার পর্যন্ত ধাওয়া করে সকলের সামনে তাঁকে খেলো করে পাটরাণীর খালি সিংহাসনটায় চেপে বসলেন।

আর আমাদের শ্রীশ্রীকেষ্ট ঠাকুর! তিনি শ্রীরাধাকে অনেক রকমে জ্বালিয়েচেন বটে, তবে রাধাও কমতি যাননি। কেষ্টঠাকুরকে দিয়ে পায়ে ধরিয়ে ছেড়েচেন ঃ দেহি পদপল্লবমুদারম্! তাছাড়া রাধা-কৃষ্ণের প্রেম অমন ক্লাসিক হয়ে গেল কেন? কৃষ্ণ দেহেই শুধু কালো ছিলেন না, কানেও কালা ছিলেন। তাই রাধিকার গঞ্জনা শুনতে হয়নি তাঁকে। রাধার গালাগালিকেও প্রশংসা ভেবে একগাল হেসেচেন!

এসব তো গেল পুরাণের পুরোন কথা। অতি-বাস্তব ইতিহাসের মধ্যেও নারীর কাছে পুরুষ হচ্চে স্রেফ ঠুঁটো জগন্নাথ। নারী মুখে পুরুষকে বলে 'নাথ', আর মনে মনে জানে 'অনাথ'।

অনেক আগে একটা ইংরেজি সিনেমা দেখেছিলাম। তাতে ইংল্যাণ্ডের রাজা রিচার্ড দি লায়ন হার্টেড যুদ্ধে যাবেন। তাঁর গায়ে বর্ম আঁটা হয়েচে, কোমরে তলোয়ার বাঁধা হয়েচে, বাইরে বিউগল বাজচে, এমন সময় রাণী কী কথায় গেলেন ক্ষেপে। রেগে বিছানার বালিশ, চেয়ারের কুশন ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারতে লাগলেন রাজাকে। আর যোদ্ধা রাজা দু'হাতে মুখ ঢেকে নিজেকে লাগলেন সামলাতে। সে কী নাজেহাল অবস্থা!

কুইন এলিজাবেথ, কুইন ভিক্টোরিয়ার দাপটে তখনকার বিশ্বও ছিল কম্পমান। ঐ ইংল্যাণ্ডের আর এক রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড। তিনি তো সাধারণী এক নারীর জন্যে রাজ সিংহাসন ছেড়ে পথে নামলেন। কটাক্ষের এমনি টান।

বর্তমান ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিসেস থ্যাচার মহাশয়াও কম যান না। নিজের গণ্ডীর বাইরে ফৌজ পাঠিয়ে আর্জেন্টিনার জান কয়লা করে দিয়ে ফকল্যাণ্ডকে ফাঁসিয়ে দিলেন। শ্রীলংকার নায়িকা শ্রীমতী বন্দরনায়েক ছিলেন রীতিমতই লায়েক। ইজ্রায়েলের শ্রীমতী গোল্ডামেয়ার মেয়ে হয়েও ছিলেন রাজনৈতিক মায়াবিনী। সেদিনের এই ভারতের সাম্রাজ্ঞী রাজিয়া, নূরজাহান একদা পুরুষদের নাচাতেন অঙ্গুলি হেলনে। আর আজকের ইণ্ডিয়ায়? এখন ইণ্ডিয়া মানেই ইন্দিরা। তখনকার বাঘা বাঘা নেতারা ভেবেছিলেন, ইন্দিরা? আরে হামলোগকো জওহর-ভাইয়াকো ফ্রক পিননেওয়ালী লেড়কি! উ তো হামলোগকো হাতমে পুতুল নাচে গা। কিন্তু দেখা গেল বাঘা-বাঘা নেতারা তাঁকে বাগে তো আনতে পারলেনই না, বরং ল্যাং খেয়ে-খেয়ে নেতিয়ে পড়লেন মাটিতে।

আমার এক বন্ধু খুব মিটিংবাজ। দিনে দশ বারোটা সভায় বক্তৃতা করে। হোমিওপ্যাথিক সম্মেলন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি দরকার কিনা—তাই নিয়ে গড়গড় করে ভাষণ দেয়। পরে বাড়ি এলে তার স্ত্রী তখন গলা ছাড়েন—ঐ এলেন বক্তা! বাড়ি ফেরার কথা মনে হলো এতক্ষণে। বক্তার তখন মুখে চাবি।

আর ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। বোঝাই যাচ্চে—নারীমাত্রেই শক্তিরূপেন সংস্থিতা! অতএব নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমঃ নমোহ।

অথচ মনু বলেছিলেন, মেয়েরা একলা থাকবার যোগ্যা নন। তাঁরা শৈশবে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকবেন। ওটা মেয়েদের ঘরে বন্দিনী করে রাখবার চক্রান্ত মাত্র। তাই তো মনু-সংহিতা গৃহিণীদের কাছে মানই পেলো না।

সেদিক দিয়ে গীতা বরং মেয়েদের কাছে গ্রাহ্য ধর্মপুস্তক। তাতে আছে 'সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়স্যামি মা শুচ।' হে আমার ভক্ত, তুমি সব ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাকেই শুধু ভজনা করো। আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করবো।

এখন বরং মনুসংহিতার বদলে একটা পুং-সংহিতা লেখা দরকার। যাতে থাকবে, পুরুষরা একলা থাকবার যোগ্য নয়। তারা শৈশবে থাকবে মায়ের কোলে, যৌবনে থাকবে স্ত্রীর আঁচলে, বার্ধক্যে থাকবে মেয়ে বা পুত্রবধূর কবলে।

আসলে পুরুষ হচ্চে কথামালার সেই সিংহের চামড়া-ঢাকা গর্দভ। বাইরে ভীষণ, ভিতরটা ভসভসে! পুরুষ বিয়ে করে তার দেবীর বাহন হবার আগে পর্যন্ত পুরুষ তবু পুরুষই থাকে, পৌরুষও দেখায়! কিন্তু একবার ঐ ছাতনা-তলার মালার বাঁধনে পড়লে তিনি আর স্বামী থাকেন না, হন গো-স্বামী।

মেয়েদের মতে বিয়ের পর পুরুষরা কি রূপ নেয়, তার বর্ণনা দিই।

'স্বামীগুলা বাছুরের মত। বাঁধিতে গেলে ঢুঁ মারিতে যায়। আবার আদর করিলেই সব ঠাণ্ডা! তখন শক্ত খুঁটিতে বাঁধিলেও আপত্তি করে না। এমন কি, পরে বাঁধন খুলিলেও আশেপাশে ঘুরঘুর করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। হাতে করিয়া না খাওয়াইলে খাইতেও চায় না অনেক সময়।'

রবীন্দ্রনাথও বিয়ের টোপর নিয়ে 'গোড়ায় গলদ'-এ রসিকতা করেচেন—

'সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ঐ রকম (টোপরের মত) চেহারা। এই 'এত'টা বৎসর যা-কিছু আশা আকাঙ্খা জন্মেছিল—ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটানো প্রভৃতি যে সকল উঁচু-উঁচু ভাবের পলতে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল, সেগুলিকে ঐ টোপরটা চাপা দিয়ে একদম নিবিয়ে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে বসতে হবে।'

রসরাজ অমৃতলাল তো 'পতি'কে 'পতিত' নামে আখ্যা দিয়েচেন—

ব্যঙ্গপ্রিয়া রঙ্গময়ী কোন রসবতী।
উপহাসে ক্রীতদাসে নাম দিল পতি॥
বিবাহেতে পুরুষের হয় সংঘটন,
স্বাধীনতা-স্বর্গ হতে প্রথম পতন।
হারায় অন্তরে 'ত'টি 'পতিত' পতনে।
তাই সতী ডাকে তাকে 'পতি' সম্বোধনে॥
পত্নী পদতীর্থে সদা গড়াগড়ি যায়।
তাতেও গয়ার পাপী 'পতি' নাম পায়॥
দুর্গতি কুমতি ক্ষতি প্রণতি মিনতি।
এসবের সনে বেশ মিল খায় পতি॥'

অথচ বিয়ে করা ছাড়া তো পুরুষের উপায়ও নেই। বিশেষ করে অকর্মণ্য পুরুষদের পক্ষে—যারা নড়ে বসতেও জানে না। শৈশবে মা মাসি পিসি ঠাকুমা দিদিমার আদরে তারা এমনি দেহে-মনে খোঁড়া হয়ে যায় যে বয়েস বাড়লেও আর পাকে না, কাঁচাই থেকে যায়। তখন স্ত্রী-ই ভরসা। এবং স্ত্রীর আঁচলের তলায় তিনি তখন 'বুড়ো খোকা'।

আসলে বঙ্কিমী মতে—'লাঠি'র যেমন দিন গিয়াছে, তেমনি হায় পুরুষ, তোমারও দিন গিয়াছে। যেদিন হইতে লাঠি ছাড়িয়া কলম ধরিয়াছ, লাঠ্যৌষধ ছাড়িয়া তোয়াজ এবং পেঁয়াজী ধরিয়াছ, খাঁটি দুধ ছাড়িয়া চা ধরিয়াছ, মালকোঁচা ছাড়িয়া পায়জামা ধরিয়াছ, পা-চলা ছাড়িয়া বাস ধরিয়াছ, সেইদিন হইতেই তোমার মাথায় বাঁশ পড়িয়াছে। তোমার পূর্ব-পুরুষরা হারেম পুষিয়াছে, একশোটা বিবাহ করিয়াছে। গো-কুলে ষণ্ডের মতই যূথপতি হইয়া চড়িয়াছেন। আর এখন তোমার একটিমাত্র সবেধন (সবে-ধনি) স্ত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তোমার ইস্তিরি। কেবল তোমাকে ছেঁকা দিতেছেন তোমাকে চাপিয়া 'পাট' করিতেছেন। ছেঁকা খাইয়া ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করিয়া তোমার দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে।

পুরুষ এখন নারীর দাঁতের বুরুষ মাত্র। দাঁত খিঁচোবার জন্যে, দাঁত খোঁচাবার জন্যে, দাঁত ঘষবার জন্যে আর দাঁতের উপর রাখবার জন্যে দরকারী উপকরণমাত্র। একবার করায়ত্ব হলে ভোগ করবার জন্যে, ভোগাবার জন্যে। কিন্তু অন্যের ভোগে লাগবার জন্যে নয়। Not Transferable.

এবার গোপনেই বলি—তা হবে না-ই বা কেন? কন্যাটির পিতা মোটা-টাকার বরপণ দিয়ে একটি পুতুল কিনে দিয়েচেন তাঁর কন্যাকে! না, ঠিক কথায় একটি ক্রীতদাস কিনে দিয়েচেন!

আজ তাই স্বামী-মার্কা ক্রীতদাসদের একমাত্র প্রার্থনাটা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একটু ঘুরিয়ে বলি—

পুরুষের পুরান ভাগ্য ফিরে পাইবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।
নত করি মাথা
আর কতদিন 'স্ত্রী'মুখের কথা
শুনে যাব যা-তা!

কিংবা আগামী দিনের 'শরৎবাবু'র কাছে করুণ প্রার্থনা—

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে-র 'মানুষ'···
তোমাকে দোহাই দিই, শরৎবাবু,
একটি সাধারণ 'স্বামী'র গল্প লেখো তুমি!
বড় দুঃখ তার!

মেকি যুগের আশ্চর্য ঃ মাইক

আমার মতে, এ যুগের পরম আশ্চর্য হচ্চে — মাইক।

আগে ভগবানের একখানা সার্টিফিকেট ছিলো, মূকং করোতি বাচাল। এখন সে সার্টিফিকেটখানা কেড়ে নিয়েচে ঐ মাইক। মাইক-ই এখন মূককে বাচাল করে, মুখর করে তোলে। মাইক দেখলে মুখ চুলবুল করে ওঠে না, এমন লোক খুব কম। আর মাইকের সামনে দাঁড়িয়েও যে লোক মুখর হয় না, সে হয় আংশিক মূক, না হয় মূর্খ।

মাইক যেন চুম্বক। মনের কথা মুখ দিয়ে বার করে নিয়ে সরবে আর উচ্চরবে ছড়িয়ে দেয় সুদূরে সব ধারে। একটা ছোট কথাকে বড় করে সবার কানে লাগানো — এমন অসভ্যতা এই মাইকের পক্ষেই সম্ভব। অথচ আজকের সভ্য জগতে এই কল বা কৌশলের ব্যবস্থা না থাকলে অর্থাৎ অ-মাইক ব্যবহারে কোন কিছুই সম্ভবপর নয়। সব আয়োজনই বরবাদ হয়ে যায়।

ধরা যাক, একটা বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েচে। বহু টাকা খরচ করে প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েচে। রঙীন কাপড়ে সে প্যাণ্ডেল সাজানো হয়েচে। ঝাড়বাতি ঝোলানো হয়েচে। চেয়ার ভাড়া করে আনা হয়েচে শ'পাঁচেক। কিন্তু মাইক-ওয়ালা তখনো এসে পেঁৗছোয়নি। সর্বনাশ! কর্তৃপক্ষের মাথায় হাত। মিটিং মাটি হবার যোগাড়! ছোট্-ছোট্। এ'কি গভভো-যন্ত্রণারে বাবা!

বহুবিবাহের যুগের বিষময় ফল দেখাতে বিদ্যাসাগর মশায় লিখেচেন — বাড়ির বিবাহিতা মেয়েটি অবৈধভাবে হঠাৎ গর্ভবতী হলে তখন তার বাবাকে ছুটতে হতো কুলীন জামাইকে হাতে-পায়ে ধরে আনবার জন্যে। যাতে একটা রাত তাঁর বাড়িতে কাটিয়ে যায়, যাতে জাত রক্ষা হয়, কুলমান বাঁচে। এও যেন তাই। হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে আয় শীগ্গী মাইক-ওয়ালাকে, এই সন্ধ্যার

জন্যে। জাত-মান বাঁচুক। যাক, তাকে স-মাইক ধরে আনা গেল রাগ দেখিয়ে নয়, বেশ অনুরোধ উপরোধ করে, অমায়িক ব্যবহার করে। তারপর তিনি মাইক অ্যামপ্লিফায়ার ফিট করে মাইকের সামনে মুখ রেখে শুরু করলেন, হ্যালো টেস্টিং ওয়ান-টু-থ্রি! তখন সত্যিই মনের মধ্যে একটা থ্রিলিং ভাব চাগাড় দিয়ে ওঠে! যাক্, বক্তাদের কথা থ্রো করাবার একটা ব্যবস্থা হলো। মিটিং চললো! একজন বক্তা মাইকের সামনে হাত-পা নেড়ে, কখনো বা মাইকের টুঁটি চেপে ধরে, আর আবেগময় বক্তৃতায় থুতু-বৃষ্টি করে মাইকের মুখ বেশ ভিজিয়ে তুলেচেন, সারা প্যাণ্ডেল গমগম করচে—হঠাৎ এমন সময় মাইক ফেল করলো। মাইকের টুঁটি চেপে ধরায় আর তার মুখে অনবরত থুতু দেওয়ায় মাইকই হয়তো গোঁসা করলো, বিগড়ে গেল।…ব্যস! সারা প্যাণ্ডেলে পেণ্ডামনিয়াম। হৈ হৈ! মাইক-মাইক! কথা শোনা যাচ্চে না। মাইক মূক হওয়ায় বক্তা নীরব, শ্রোতারা তখন মুখর!

অতএব বুঝতে পারচো, মাইক কী বস্তু। ভালোর ভালো, মন্দের মন্দ। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে তোমার মুখের দুর্গন্ধ শোঁকালে আর মুখে থুতু ছড়ালে ও-ও গ্যাঁক-গ্যাঁক করে প্রতিবাদ করবে। আবার একটু দূরে সরে ভদ্রভাবে কথা বললে তোমার সব কথাই হুবহু সরবে পেঁছে দেবে তোমার শ্রোতাদের কাছে! আবার মাঝেমাঝে বক্তার কথার মাঝখানে হঠাৎ চোঁ-চোঁ-ও করে ওঠে। অনেকে বলে, ওটা যান্ত্রিক গোলযোগ। আমার মনে হয়, ওটা বক্তার কথার প্রতিবাদ!

আবার মাইক কী রকম ভ্যাংচায়, লক্ষ্য করেচো? আচ্ছা, তুমি না হয় লম্বা ঢেঙা, বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়েচো মাইকের সামনে। অমনি উনি ঘাড় উঁচিয়ে লম্বা হয়ে তোমার মুখের সামনে মুখ রাখলেন। তারপর তোমার পরে আমার হয়তো বক্তৃতা দেবার পালা, আর আমি একটু বেঁটে খাটো মানুষ। অমনি উনি ঘাড় নামিয়ে নীচু হয়ে দেখলেন, বাপস, লোকটা কী বেঁটে! সামনের পাঁচজনকে চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখানোও চাই! মানে, অপমান করবার চেষ্টা। মাইক নয় তো, যেন মানুষ মাপবার যন্ত্র। তবে মিথ্যে বলবো না, মানীকেও মান দিতে জানে ঐ যন্ত্রটা। হয়তো মানী সভাপতি বললেন, আমি বসেই বলবো। বেশ! উনি অমনি কোমর বেঁকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভক্তের মতো তাঁর কথা শুনে প্রচার করতে লাগলো।

প্রচার! এই প্রচার থেকেই মাইকের জন্ম। আত্মপ্রচারের জন্যেই আজ

আমরা নীরবে সহ্য করচি সরব মাইকের অত্যাচার, অনাচার ! আমি কী করচি বা আমরা কী করচি, তারই কাহিনী পাঁচখানা করে পাঁচজনকে শোনাবার জন্যেই এই মাইকের কাছে অমায়িক হয়ে থাকতে হয় ! তাছাড়া ভেজাল খেয়ে খেয়ে বুকের জোর, মুখের জোর, (না, মুখের জোর ঠিকই আছে) গলার জোর, সব তো কমে গেচে। চিঁচিঁ করি বলেই চীৎকার করবার জন্যে একটা অবলম্বন চাই তো। তাই এই মাইক। নইলে আগে যখন মাইক ছিল না ? তখনও তো বড়বড় বাগ্মীরা বক্তৃতা দিয়েচেন, । বড় বড় হল-এ দিয়েচেন, বড় বড় খোলা মাঠে দিয়েচেন। আর লোকে সেসব বক্তৃতা শুনতেও পেয়েচে।

আসল কথাটা হচ্চে এই, তখনকার লোকেদের মন ছিল দরাজ, গলা ছিল দরাজ ! তারা দরাজ গলায় কথা বলতেন, আসরে গাইতেন, মঞ্চে অভিনয় করতেন এবং সব বিনা মাইকেই। এখন আমাদের সে দরাজ মনও নেই, গলাও নেই। কাজেই গলার স্বর আর তেমনি খোলা দরজা দিয়ে বেরোয় না, বেরোয় গ্রীল দেওয়া জানলা দিয়ে। তাছাড়া আজকাল নাকি চেঁচিয়ে কথা বলা অভদ্রতা। মিহি গলায় চিবিয়ে-চিবিয়ে, মেপে মেপে কথা বলাই নিয়ম ! আমার মেয়েকে গান শেখাবার জন্যে এক গানের মাষ্টার মশায়কে রেখেছিলাম ! কিছুদিন বাদে মেয়েকে ডেকে বললাম, রুনু, একটা গান গা তো শুনি, কেমন শিখলি। রুনু হারমোনিয়ম নিয়ে বসলো। কিন্তু দেখি তার গলার স্বরই ওঠে না। আমার আবার নজরুলের গান শোনা-কান। বললাম, ও কিরে, একটু গলা ছেড়ে গা। উত্তরে মেয়ে বললো, মাষ্টারমশায় বলেচেন, গাইতে গিয়ে ষাঁড়ের মত চেঁচাবে না, গলা চেপে গাইবে। (হয়তো দাঁত চেপেও !) আরো নাকি বলেচেন, তা হলেই নাকি গলা মাইক ফিটিং হবে। হয়তো। ভেবে দেখলাম, ঠিকই। গলা ছাড়াটাও ঠিক নয়। মানে কোন কিছুই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, আজকালকার দিনে।

আজকের দিনে আমাদের জীবনে মাইকের মওকা লেগেই আছে। জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতার দিয়ে। তেমনি জন্মালে এখনও মাইক দরকার হয় না বটে, (যদিও শাঁখ বাজে), তবে মৃত্যু আর বিয়ে দুইই মাইক দিয়ে। মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধ-বাসরে যে কীর্তন গাওয়া হয়, তাতে মাইক না হলে জমে না। আমি যে মরেচি, আমার যে ছেরাদ্দ হচ্চে, সেটা সংকীর্তনে সরবে মাইক মারফত ঘোষণা না করলে আমার আত্মাটাই হয়তো মাঝপথে ঝুলতে থাকবে ! তাছাড়া আমি যে একটা হেজি-পেজি ছিলাম না, বা আমার ছেলেরা যে একএকজন

করিতকর্মা—সেটা শ্রাদ্ধবাসরের সাজসজ্জা, কীর্তনীয়ার গলার কারুকার্য আর সবার ওপরে মাইকের গ্যাঁক গ্যাঁক আওয়াজই তো সেটা প্রমাণ করবে! নইলে তো প্রেস্টিজ পাংচার। মাইকের গ্যাঁক গ্যাঁক আওয়াজে পাড়ার লোকের কান হয়তো ঝালাপালা হতে পারে, কিন্তু সেজন্যে কিসসু বলতে বা করতে পারে না তারা। কারণ, এটা বোম্বাই ফিল্ম-এর গান নয়। আর আপত্তি করলে বুঝতে হবে, পাড়াপ্রতিবেশীরা কীর্তন গানের মর্ম বোঝে না এবং রীতিমত নির্মম নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর এই কারণে যে, আমার আত্মা ওপরে উঠে না গিয়ে মায়ার বাঁধনে কেবলই নীচের পার্থিব জগতে ফিরে আসতে চাইচে আর মাইক তার বিকট আওয়াজে ইথারে ধাক্কা মেরে মেরে তাকে ওপরের দিকে ঠেলে ঠেলে দিচ্চে, আর সে সময়ে দল পাকিয়ে এসে মাইক থামানো মানে শুধু নিষ্ঠুরতা নয়, হিন্দুধর্ম বিরোধী কাজ। মাইক আমাদের পারলৌকিক কাজে পরপারে ঠেলে দেবার কান্ডারি!

আর বিয়ের ব্যাপারে মাইক? তাও আবার খুলে বলতে হবে? আমি যে আমার ছেলের বিয়েতে দামী আর নামী সানাইয়ের দল নিয়ে এলাম, সে কথাটা তারস্বরে কে জানাবে? আমি? না মাইক? আর যদি সানাই না আনাই—সানাইয়ের রেকর্ডই বাজাই—সেটাও তো সরবে মোকাবেলা করা দরকার ঐ মাইকের কৃপাতেই। আমার তো মনে হয়, বিয়েতে গাধার টুপির মতো বরের টোপর না হলেও চলে, গাঁটের কড়ি খরচ করে ভূত-ভোজন না করালেও ক্ষতি নেই, কিন্তু বিয়েতে মাইক চাই-ই। বিয়ে মাইনাস মাইক—একটা ইয়ে। ফার্স। curse. বিয়ের ব্যাপারে দুটি মন, দুটি প্রাণ, দুটি অর্ধাঙ্গ এক হতে চলেচে যখন, তখন সে কথা সানন্দে সগৌরবে সরবে পাড়া মাতিয়ে জানাবে তো ঐ মাইকই!

তবে ঐ বিয়ের ব্যাপারেই মাইক যে কতদূর সর্বনাশা হতে পারে, তা বুঝি জানা নেই? বাপস, ভাগ্যিস আমাদের বিয়ের সময়ে ঐ মাইক-ফাইক ছিল না। খুব বেঁচে গেচি! নইলে কী কেলেংকারিই না হতো! মানে ব্যাপারটা ঘটলো আমার ছোট শালার বিয়েতে! আমার এক ভায়রাভাই ঐ মাইক-ফাইকের ব্যাপারটা বেশ বোঝে! সে কোত্থেকে এক মাইক ভাড়া করে এনে ফুলশয্যার খাটের মাথার দিকে ফুলের আড়ালে মাইকের মাউথ-পীসটা ফিট করে দিলো আর তার সরু তার ফুলের আড়াল দিয়ে এনে পাশের ঘরে জুড়ে দিলো অ্যামপ্লিফায়ারের সঙ্গে! ব্যস, শুরু হয়ে গেলো খেল্! শালা তো সন্ধ্যে

থেকেই ছোঁকছোঁক করচে কখন গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে বৌয়ের পাশে শোবে। কিন্তু একগাদা ইতরজনা-দের মিষ্টান্নম সাঁটাই শেষই হয় না! তা শেষপর্যন্ত শেষ হলো খাওয়া দাওয়া। চতুর শ্যালক তো খাটের তলা টলা, আলমারির পেছন, পর্দার আলনার আড়াল আবডাল ইত্যাদি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে দরজা বন্ধ করে এসে শুলো নতুন বৌয়ের পাশে। যাক, কেউ তাহলে আড়ি পাততে আসেনি। ওদিকে কিন্তু পাশের বন্ধ ঘরে, তার বোন ভগ্নীপতিরা টেলিভিশন দেখার মত (আহা, পরে একদিন তেমনটাও হবে হয়তো!) অ্যামপ্লিফায়ারের চারধারে বসে আছে। বেচারা তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। একটু পরেই প্রোগ্রাম শুরু হলো—

—তোমার নাম কি?

অমনি মুখপোড়া মাইক আমাদের ঘরে চেঁচিয়ে বলে দিলো, তোমার নাম কি?

কোন উত্তর নেই।

—ও, তোমার কোন নাম নেই বুঝি?

—(মাইকে) ও তোমার কোন নাম নেই বুঝি?

এবার উত্তর, না।

—(মাইকে) না।

—তোমাকে কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে!

—(মাইকে) তোমাকে কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে।

—ছাই!

—(মাইকে) ছাই!

—আমি তোমাকে খুব ভালবেসে ফেলেচি। তুমি?

—(মাইকে) আমি কিন্তু তোমাকে খুব ভালবেসে ফেলেচি। তুমি?

—জানিনে, যাও!

—(মাইকে) জানিনে যাও!

এইভাবে প্রায় সারারাত চললো এক তরফা প্রেমালাপ, উঁ-আঁ, চুক-চাক শব্দ। আর নির্লজ্জ মাইকটা সব আমাদের কাছে বেফাঁস করে দিতে লাগলো। আর চাপা খুকখুক হাসিতে আমাদের পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়।

সত্যি, লোকে বলে মেয়েমানুষের পেটে নাকি কথা থাকে না. এ তো দেখচি মুখ-সর্বস্ব মাইকের পেটেও কোন কথা থাকে না। (আর পেট তো

নেই, কাজেই পেটে কথা রাখবে কি করে?) মুখে কোন আগল নেই মাইকের।

অথচ এই মাইকের মাতামাতি তো দেখছি সর্বত্র। আর ইনি বহুরূপে সম্মুখে তোমার! বড় বড় নেতাদের বড় বড় বক্তৃতার সময় তাঁদের মুখের সামনে সাজানো থাকে প্রায় আধ-ডজন মাইক। নেতাদের বানী টেপরেকর্ডারে টুকে নেবার জন্যে দলে দলে রিপোর্টাররা তাঁদের মুখের সামনে ধরেন গাঁজার কলকের মত লম্বাটে মাইক। সেদিন টালিগঞ্জে একটা স্টুডিয়োতে সুটিং দেখতে গিয়ে দেখি অভিনেতার মাথার উপরে কপিকলে ঝুলচে একটা মাইক, ঠিক যেন সুকুমার রায়ের সেই 'খুড়োর কল'-এর মতো।

তাছাড়া পুজো-মণ্ডপে হিন্দি ফিল্ম-এর জন্যে মাইক, ভোটে 'ভোটফর'-এর জন্যে হাত-চোঙা মাইক, মেলা-প্রদর্শনীতে হারানো-প্রাপ্তির জন্যে মাইক, ফুটবল খেলায় ঘরে বসে রিলে শোনবার জন্যে মাইক, জলসায় গানের জন্যে মাইক, নাচে পায়ের ঘুঙুর শোনবার জন্যে মাইক, মফঃস্বলে সাইকেল-রিক্সায় সিনেমার বিজ্ঞাপনে মাইক, অ্যামেচার থিয়েটারে নাকের সামনে মাইক — মাইক কোথায় নেই?

আর মাইকের বাবার বাবা হচ্চে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর মাইক। সরকারী দরকারী মাইক। একেবারে ভি-আই-পি। অতি সাধারণ মাইকের বুকের জোর আর কতটুকুন? বড় জোর সিকি মাইলটেক। আর রেডিয়োর মাইক? তামাম ভারত-জোড়া তার হাঁকডাক! তাই তো হিল্লি-দিল্লির খবর কলকাতায় এঁদোগলিতে স্যাঁতসেঁতে ঘরে ভাঙা চৌকিতে শুয়ে পা নাচিয়ে-নাচিয়েও শুইতে পাই! তাছাড়া রুশ আমেরিকাও এই মাইকেরই কল্যাণে আমার সঙ্গে গলায় কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয় করে যায়।

এইসব দেখেই তো চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, মাইক মাঈকি জয়! সন্দেহ হয়, মায়ের পরেই মাইক, না মাইকের পর মা। এখন মায়ের কথার জোর নেই, কিন্তু মাইকের আছে!

তা জয়-ধ্বনি দেওয়া যায় মাইককে। মাইকের অনেক দোষ থাকলেও, গুণ বড় কম নেই। মানে, দোষে গুণে যেমন মানুষ, তেমনই মাইকও। দেখো, মাইক তার মালিকের জন্যে ভাড়া খাটে, গলায় লকেট ঝুলিয়ে তার নাম প্রচার করে, মালিক যেখানে নিয়ে যায় সেখানে মুখটি বুজে যায়, আর তার কথামতো সব রকমের লোককেই ফেস করে, অথচ কখনো গুজব রটায় না।

বক্তা যেটুকু নীচু গলায় বলে, মাইক ঠিক সেইটুকুই সগর্বে উঁচু গলায় সকলকে জানিয়ে দেয়।

একে যদি বলো তিল থেকে তাল করা—তা বলতে পারো, তবে বলাটা অন্যায় হবে। তাহলে গোপনেই বলি, আমার গোপালের মা—কার কথা বলচি, বুঝতেই পারচো, তার গলাটা ঠিক মাইকের মতোই। বেশ ধারালো আর বেশ সুর-ওলাও। তাছাড়া মাইকের মতোই মুখসর্বস্ব আর পেটে কোন কথা থাকে না। তবে তাঁর আবার দুবেলা মুখের সামনে আহার জোগাতে হয়, যাতে পেটটা তাঁর বেশ ভার থাকে। তা এক-এক সময় ভাবি, মাইকওলাদের মতো সভা সমিতিতে ওঁকেও ভাড়া খাটালে কেমন হয়? (মানে, ওঁর গলার জন্যে!) অন্তত দুটো পয়সা তো ঘরে আসে। কিন্তু তা কী আর হবার যো আছে! আমি যদি ডাইনে যেতে বলি, উনি যাবেন বাঁয়ে। আমি যদি চুপ করতে বলি, উনি গ্যাঁক গাঁক করবেন। কাজেই বক্তা যদি একটা কথা ওঁর কানে দেন, অমনি উনি পাঁচখানা করে বানিয়ে পাঁচকান করতে থাকবেন! তিলকে তাল করবেন। মানে অনেক মানুষের গলা মাইকের মতো হলেও, মাইকের মতো কাজ মানুষকে দিয়ে করানো যায় না। এখানেই মাইকের কাছে মানুষের হার। মুখসর্বস্ব মাইক আন্তরিক ভাবে অমায়িক, মানুষ অমায়িক মৌখিকভাবে। মাইক পরের কথা পরকে শোনায় পরের মতো করেই, নিজের মতো করে নয়। ধূপ যেমন নিজেকে পুড়িয়ে পরকে ছড়িয়ে দেয় গন্ধ, মাইকও তেমনিই। নিজেকে বক্তার মুখে ধরিয়ে তার স্বরকে সুরকে দেয় ছড়িয়ে।

এ হেন মাইককেও লোকে নিন্দে করে। গতবার পুজোর সময় দক্ষিণ পাড়ায় আমার নগ্নযুগের বন্ধু নন্তের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম। গিয়ে দেখি তার বাড়ির ঠিক সামনেই দুর্গাপুজোর প্যাণ্ডেল, আর তার বাড়ির দিকেই মুখিয়ে আছে অ্যাম্লিফায়ারটা, আর মাইকে হিন্দি ফিল্মগানের ফায়ারিং চলচে—লে হালুয়া, লে পোলোয়া! নন্তেও রেগে ফায়ার। কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়। আমি যেতেই আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বললো, দ্যাখ্‌ আমার দুর্গতি! জানিস, আমি এজন্যে দশ টাকা চাঁদা দিয়েচি! দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌ একবার, এই মেকি যুগে মাইকেরই জয়জয়কার। মেকি সুর, মেকি আওয়াজ। আগেকার সেই আসল সুর কেমন অসুর হয়ে বেরুচ্চে! আমি কী ভাবচি জানিস? চেঁচিয়ে বললাম, কী? বললো, পুজোয় নেহাৎ হাত খালি হয়ে গেচে নইলে টিকিট কেটে চলে যেতাম কোথাও, যেখানে মাইক নেই।

বাইক নেই, পাইক নেই। আর এ অসভ্যতা সহ্য হয় না। আবার চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলাম, তোর কথা বুঝলাম না। নন্তে বললো, অতি সহজ কথা। যেখানে ঐ মাইকের উৎপাত নেই, যেখানে বাইক মানে যানবাহনে চাপা পড়বার ভয় নেই, আর যেখানে পাইক মানে কারোর চোখ রাঙানি নেই। বুঝলি! বুঝলাম। বললাম, তবে বুঝে রাখ্, ইহ সংসারে তেমন আর কোন জায়গা নেই। বনও নেই। বন সব সহর হয়ে যাচ্চে। আচ্ছা, তুই বোস। আজ দেখ্চি গল্প করা যাবে না। অন্যদিন আসবো। বলেই কেটে পড়লাম।

ফেরবার সময় বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ভাবতে লাগলাম, এই মাইক তো সত্যিই যা-তা জিনিস নয়। মনে হয় যেন বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের হাতের বাঁশরী আধুনিক বংশধর এই মাইক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন সম্ভবামি যুগে যুগে। বলেছিলেন দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্যেই তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হবেন। আজ বুঝি এই মাইক এ যুগে অবতার রূপে আবার আবির্ভূত হয়েচে—অবশ্য নন্তেদের মতে দুষ্টের মজা আর শিষ্টের সাজা-র জন্যে। তবে এ-ও তো ঠিক, শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাঁর মনের কথা বাঁশীর মাধ্যমে শ্রীরাধার কানে পেঁাছে দিতেন, ঠিক তেমনিই আজ মাইক তার বক্তার মনের কথা পেঁাছে দিচ্চে হাজার জনের কানে। কিংবা হাজারো লোকের মাঝখানে মাইকের কল্যাণে গানে ঠিক পেঁাছে দিচ্চে প্রেমিকার কানে প্রেমিক-গায়ক তার মনের কথা।

তবে, মুখসর্বস্ব মাইক তার বক্তার মুখের কথাটাই পেঁাছে দেয় হাজার জনের কানে। আহা, যদি সব মানুষের মনের কথা চেঁচিয়ে বলতে পারতো ঐ মাইক! আচ্ছা, তেমন যদি কোন মানসিক-মাইক বার হয়! যে মাইকটা স্টেথিস্কোপের মত বক্তার বুকে ঠেকালে তার মনের কথাও ছড়িয়ে পড়বে পাঁচজনের কাছে! সেক্ষেত্রে তো বক্তাকে হতে হবে মনে মুখে এক। নইলে ব্যাপারটা বড় গোলমেলে হয়ে দাঁড়াবে যে! ধরো বক্তার মুখের সামনে মাইক, তার বুকে ঠেকানোও মাইক—

বক্তার মাইকে শোনা গেলো—উপস্থিত আমার ভায়েরা বোনেরা—
অমনি তার বুকের মাইক বলে উঠলো—ভাই বোন, নাঁ, ছাই।

আবার মুখের মাইক ঃ আজ আমরা যে শুভকাজের জন্যে সমবেত হয়েচি, *সেজন্যে চাই অর্থ-সাহায্য—অনাথ শিশু-আশ্রমের জন্যে—*

অমনি মনের মাইকে শোনা গেলো—টাকাগুলো পেলে হয় ! একটা মোটা রকম দাঁও মারা যাবে !

না, না । এমন মাইক যেন না হয় ! বিশ্রী ব্যাপার হবে । অন্তত আমি যতদিন বেঁচে আছি । কারণ আমাকেও তো মাঝেমাঝে মাইকের মুখের সামনে দাঁড়াতে হয় কিনা ! কান্তকবির ভাষা একটু বদলে বলি--

সকলই তো হবে বিজ্ঞানের বলে নাহি অসম্ভব কাণ্ড,
তবে তার আগে যেন কেটে পড়ি আমি
নইলে হাটে ভেঙে যাবে ভাণ্ড !

অথ উপহার কথা

এই 'উপ' কথাটা শুনলেই আমার গা-টা কেমন গুলিয়ে ওঠে। যদিও 'উপ' দিয়ে কয়েকটা ভাল কথা আছে, কিন্তু সেগুলো এখন শুধু কথা-ই। যথা, উপকার (উপকার কে এখন করে ?), উপবীত (এর মান এখন খোয়া গেচে !) উপবেশন (বাসে-ট্রামে ভাবাই যায় না।) উপশম (আমাশা থেকে শুরু করে ব্লাডপ্রেসার, ডায়বিটিস, কানসার ইত্যাদির কি উপশম হয় ?) উপদেশ (দেওয়া বোকামি, নেওয়া হীনতা স্বীকার।) উপস্থিত (ভাবলেই কান্না পায়) উপযুক্ত (লোক বা জিনিস কই ?) ইত্যাদি।

অথচ উপদংশ, উপদ্রব, উপপতি, উপপত্নী, উপরি, উপবন, উপহাস, উপসর্গ ইত্যাদি আজকের বাজারে রীতিমতই জ্বলজ্বলে, জলজ্যান্ত। এমন কি অলী উপকথা, উপন্যাস, উপাখ্যানও এক-একখানা বাস্তব থানইঁট !

আর এই 'উপহার।' উপহারের বেশ গুরুগম্ভীর পোষাকী নাম জানা আছে তো ! উপঢৌকন ! ঠিকই। ভাবলেই ঢোঁক গিলতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মত এই উপহারের আবার নামের বাহার কত। নব-দম্পতিকে দেবার সময় 'আশীর্বাদ', অফিস কাছারিতে দেবার সময় 'ঘুস'। কোথাও-কোথাও চা পান বা সন্দেশ। পিকনিক বা পার্টিতে 'চাঁদা'। পুরোহিতকে দেবার সময় 'দক্ষিণা'। প্রেমিকাকে দেবার সময় 'প্রেজেন্ট'। উকিল ডাক্তারকে দেবার সময় 'ফি'। নাতি-নাতনীকে দেবার সময় 'খেলনা'। আর গিন্নীকে দেবার সময় ঐ উপহার হয় 'পান জর্দার খরচ' বা আরো উচ্চদরের নাম — 'সঞ্চয়'

এই দেওয়া-নেওয়ার যুগে, আমি তো দেখচি, এই উপহারের বাহার না দেখাতে পারলে যে কোন কাজেই হবে 'হার'। কার্যোসিদ্ধির জন্যে ঐ উপহারই একমাত্র বুদ্ধি। উপহারই উপায়। চাওয়া বা পাওয়ার সঙ্গে উপহার-দেওয়ার

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অবৈধ নয় বৈধ। আর খাওয়ার সঙ্গে উপহার দেওয়ার সম্পর্ক? একেবারে দুধে-জল বা জলে-দুধ-এর মেশামেশি-ভাব!

আচ্ছা, তোমরা কেউ 'কিছু' না দিয়ে 'বেশ কিছু' তো দূরের কথা 'সামান্য কিছু'-ও চেখে (খাওয়া নয়) আসতে পেরেচো? কিংবা সেরকম কোন ফ্রি-খ্যাটের উপায় জানা আছে? আমার জানবার ভারি আগ্রহ। আমি তো দেখচি বাড়িতেও প্রতি মাসের মাইনের টাকাটা উপহার না দিলে নো-আহার, অনাহার। কাজেই বাইরে তো বটেই। কী অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, বিয়েতে, বিবাহ-বার্ষিকীতে, জন্মদিনে, শ্রাদ্ধে, বগলদাবায় করে কিছু না কিছু হাসি-হাসি মুখ করে নিয়ে যেতেই হয়।

তবে হ্যাঁ, সেদিন আমার এক বন্ধু আমাকে একটা উপায় বাৎলেচে। সেক্ষেত্রে নো-উপহার অথচ আহার। রীতিমত আহার, খাতির করা আহার। গোপনে বলি—সুযোগ সুবিধামত গামছা কোমরে বেঁধে শশ্মান-বন্ধু হয়ে যাওয়া। ব্যস, তারপর তোমার খাতির দেখে কে? মৃতব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন তোমাকে বাড়ি থেকে আদর করে ডেকে এনে বসিয়ে খাওয়াবে। নইলে নাকি ঐ মৃতব্যক্তির পরমাত্মা অর্ধেক পথে ঝুলতে থাকবে। কী কাণ্ড! কিন্তু ব্রাদার, সে গুড়েও বালি পড়বে মনে হচ্চে। শীগ্রী বোধ হয় খাট কাঁধে করা উঠে যাবে। ঐ যে কী কাঁচের গাড়ি হয়েচে না? তাছাড়া ক্রিমেটোরিয়াম। খাট বওয়া নেই, চিতা খোঁচানো নেই, কাজেই বয়ে গেচে কাউকে ডাকাডাকি।

অতএব সেই উপহার। চিরন্তন উপহার!

সেদিন আমার এক অতি পরিচিত ভদ্রলোক আমাকে তাঁর ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। নিমন্ত্রণের বাহারি কার্ড বার করতেই মনে মনে আঁতকে উঠেছিলাম। কিন্তু তিনি ভেতরে ছাপা দেখিয়ে বললেন, অনুগ্রহ করে যাবেন, নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করে আসবেন, আর অনুগ্রহ করে কোন প্রেজেণ্টেসন নিয়ে যাবেন না। এই দেখুন, কোনরকম উপহার গ্রহণ করতে অক্ষম।—শুনে চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। পরে বললেন, আর অতিথি নিমন্ত্রণের জন্যে জল-যোগেরও কোন ব্যবস্থাই করচি না।—শুনে নরমে গেলাম। তবে একগাল হেসে বললাম, বাঃ বাঃ! এই তো চাই। এই রকম সাহসই দরকার! যাবো, যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। এবং যেতে হলো। না গেলে ভাববেন, খাওয়া নেই, তাই হাওয়া হয়ে গেচে। অথচ খালি হাত-পা হলেও ভিড়ে বাসে উঠতে পারলাম না, মিনিবাসও পেলাম না। শেষপর্যন্ত ট্যাক্সিতে বালি থেকে

বালিগঞ্জ গেলাম প্রায় বিশ টাকা খরচ করে। টাকাটা ট্যাক্সিওলাকে উপহার দিলাম, আর খেয়ে এলাম এক বোতল ঠাণ্ডা কোকাকোলা! ফেরবার সময় হিসেব কষছিলাম, ঐ টাকায় ক'বোতল কোকাকোলা খাওয়া যেতো।

এইরকম বিয়ের নিমন্ত্রণের কার্ড পেলেই তখন হিসেব করতে হয়। ইনকামট্যাক্স-অফিসারের মতো তখন নিমন্ত্রণ-কর্তাকে এসেস করতে হয়। তবে ট্যাক্স দাবী করবার জন্যে নয়, ট্যাক্স দেবার জন্যে। ভদ্রলোকের ভাড়া বাড়ি, না, নিজের বাড়ি, নিজের বাড়ি হলে ক'তলা, তিনি বাসে অফিসে যান না নিজের মোটরে, মোটরটার কী মেক, মডেল কত, চাকরি না ব্যবসা, বাড়িতে রেফ্রিজারেটার, টেলিফোন, টেলিভিসন আছে কিনা ইত্যাদি এবং বাজারে তাঁর মান-সম্মানের উচ্চতা কতটা—সব কিছু মেপেজুপে হিসেব করে দেখতে হয়! তারপর ফাইনাল অথোরিটি হার-হাইনেস-এর শরণাপন্ন হতে হয়। হ্যাঁগা, কত দামে কী কেনা যায়! কারণ এসব ব্যাপার তোমার নিজের বুদ্ধিতে কুলোবে না। ঐ যে ভদ্রলোক কেষ্টবাবু, যিনি তোমাকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন, তিনি আট-দশ বছর আগে তোমার মেয়ের বিয়েতে কী উপহার দিয়েছিলেন, তা কী তোমার মনে আছে? তোমার হাইনেস-এর মনে আছে। তাঁকে জিগ্যেস করলেই বলে দেবেন, খুকীর বিয়ের সময় উনি লাল নক্সাপাড়ের পাঁসুটে রংয়ের একটা তাঁতের শাড়ি দিয়েছিলেন পঁচিশ টাকা দামের (দামও ওঁদের মুখস্থ), তুমি ঐরকম একটা কিছু দাও। এই জন্যেই তো জ্ঞানীলোকেরা বলে থাকেন, গৃহিণী গৃহমুচ্চতে।

বিয়েতে উপহার-পাওয়া শাড়ি পছন্দ না হলে গৃহিণীরা অতিযত্নে সে শাড়ি তুলে রাখেন অন্য কোন বিয়েতে ট্রানসফার করবার জন্যে। শাড়ি ইজ ট্রানসফারেবল্। গৃহিণী-আইনে এটা বেআইনী নয়। অতএব উপহারের জন্যে শাড়ি কেনবার আগে একবার গৃহিণীকে বাজিয়ে দেখো, ঐরকম কিছু তাঁর স্টকে আছে কিনা। অনেকসময় অতিমাত্রায় সুগৃহিণীরা নিজেরাই সুপ্রস্তাব (মোটেই কুপ্রস্তাব নয়) দিয়ে থাকেন, আমার কাছে নতুন একখানা শাড়ি আছে, দাম পঞ্চাশ টাকা (হয়তো তার দাম তিরিশ টাকা), তবে তোমাকে চল্লিশ টাকায় দিতে পারি। তবে নো বাকি-বকেয়ার কারবার। ক্যাশ ডাউন। একেই বলে বিজনেস!

এইভাবে উপহার-পাওয়া শাড়ি কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়ে, তারই একটা গল্প বলি! রামবাবু শ্যামবাবুর মেয়ের বিয়েতে একটা শাড়ি উপহার

দিলেন। সেটা পছন্দ না হওয়ায় শ্যামবাবুর মেয়ে সেখানা যদুবাবুর ছেলের বিয়েতে চালান করলেন। যদুবাবুর ছেলের বৌ ফাঁক বুঝে সেখানা পাচার করলো মধুবাবুর মেয়ের বিয়েতে! মধুবাবুর মেয়ের কপাল খারাপ, তাই তার স্বামী অমূল্য অস্থানে-কুস্থানে যেতে শুরু করলো। আর একদিন লুকিয়ে বৌয়ের আলমারি থেকে ঐ উপহার-পাওয়া শাড়িখানা নিয়ে ভালবাসার 'ভেট' হিসেবে দিলো সোনাগাছিতে তার ভালবাসার মেয়েমানুষকে। ঐ পতিতাটি কিন্তু ঐ শ্যামবাবুরই মেয়ে। পাড়ার এক ছোকরার কুনজরে পড়ে ঘুরপাক খেতে-খেতে ঐ কুপল্লীতে হয়েছিলো দেহপসারিণী। তার বাবুর উপহার-দেওয়া শাড়িটা সে যে বিয়ের কনে হিসেবে আগে একবার উপহার পেয়েছিলো, তা বুঝতে পারলো না বটে, তবে পরলোও না, সযত্নে রেখে দিলো তার আলমারিতে। তারপর একদিন তার এক গুণ্ডা-প্রেমিকের হাতে প্রাণ দিলো সে। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ শ্মশানে পাঠাবার সময় বাড়ির অন্যান্য পতিতারা তাকে সাজিয়ে দিলো, আর পরিয়ে দিলো ঐ সেই শাড়িখানা! নববধূর একদা-উপহার-পাওয়া শাড়িখানা যেন তাকে অনুসরণ করলো তার জনপদবধূ হয়ে শেষযাত্রা পর্যন্ত। তারপর শেষবস্ত্র হয়ে ঢাকা দিলো তার দেহের লজ্জা!

যাকগে, শাড়ির কথা ছেড়ে অন্য উপহারের কথা বলি। আগে 'উপহার' দেওয়া হতো নিমন্ত্রিতদেরও। গোলাপী কাগজে সোনালী ছাপা উপহার বিলি করতো বিয়ে বাড়ির ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা। তাতে প্রজাপতির ছবি থাকতো, কলাগাছ আর ঘট আর স্ত্রীলোকের শাঁখ বাজানোর ছবি থাকতো। আর সেগুলো হতো নানা রংয়ের কাগজের। অনেক রকমের 'বিয়ের পদ্য' ছাপাখানাতেই পাওয়া যেতো, তার একখানা বেছে হেরফের করে লিখলেই হয়ে যেতো কেল্লাফতে। তবে প্রায় সব 'পদ্য'-র নীচেয় লেখা থাকতো প্রার্থনা গোছের কটা লাইন--হে ঈশ্বর, যাচি তব বর, চিরসুখী হয় যেন এই কনে-বর।

এখন ঐসব উপহার ব্যাক-ডেটেড! পরে খবরের কাগজের মজার খবর হিসেবে 'উপহার' ছাপা হতো। এবং কোথাও বা কবিদের ধরে নতুন কবিতা লেখার রেওয়াজও ছিল। কত কবি বিয়ের পদ্য লিখেই প্রথম জীবনে হাত-মক্‌সো করেছেন। তাঁরা নিজের নামটা ছাপা অক্ষরে দেখতে পেতেন না বটে, তবে তাদের সৃষ্টি হতো মুদ্রিত আর পঠিত এবং তাতে তাঁরাও হতেন কৃতার্থ! তাছাড়া নেমন্তন্ন! সেক্ষেত্রে 'উপহার' লিখে দিলেও বাস্তব উপহারও কিছু নিয়ে যেতে হতো।

তবে আমি লক্ষ্য করে দেখেচি, ঐ সব কবি-সাহিত্যিকদের নেমতন্ন করা লস-এর ব্যাপার। অন্যরা কত মাথা ঘামিয়ে ট্যাকের টাকা খসিয়ে উপহার দিলেন, আর সেক্ষেত্রে কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের প্রকাশকদের কাছ থেকে পাওয়া বই নিয়ে ঠেকিয়ে এলেন উপহার। অথচ ভরপেট সাঁটালেন। আগে জানতাম কবিরা হাওয়া খান, চাঁদের সুধা খান, সাহিত্যিকরা কল্পনার জগতে ঘুরপাক খান, কিন্তু বিয়ে-বাড়িতে লক্ষ্য করা যায় এঁদের বাস্তববুদ্ধি। সভা সমিতিতে পরস্মৈপদী পেয়ে পেয়ে আর খেয়ে-খেয়ে এঁরা প্রায় সর্বভূক। তবে স্বজাতির কাছে গুঁতুনি খাওয়ার আগে গেয়ে রাখা ভালো, সবাই এমন নন।

অবশ্য লক্ষ্যণীয়, কবি-সাহিত্যকরা নিজের নিজের বই দেন বলে একরকমের বই একগাদা হয় না। নইলে বিয়েবাড়িতে উপহার হিসেবে এলো হয়তো পাঁচ-খানা 'পরমপুরুষ', সাতখানা 'সঞ্চয়িতা', ন'খানা 'গীতবিতান' আরো কত কি? তাছাড়া হুড়মুড় করে উপহার আসতে লাগলো এক ডজন টেবিল-ল্যাম্প, দু'ডজন সিঁদুর কৌটো ইত্যাদি। সেগুলো পরে ছোঁ মেরে মেরে নিয়ে নিলো মামাতো, মাসতুতো, খুড়তুতো, জেঠতুতো এমনকি পাড়াতুতো দেওর ননদরা। মাসশাশুড়ী, মামীশাশুড়ী, জেঠশাশুড়ী, খুড়শাশুড়িরাও ঐসব উপহার-হরণে পেছপা থাকেন না। মানে, উপহার হয় উপহাসের বস্তু!

আজকাল অনেকে খামে ভরে নগদ টাকা উপহার দেন। তাতে টাকাটা খুব কম দেওয়া যায় না, তবে এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার হয় না। নব-দম্পতি তাদের ইচ্ছেমত পরে কিছু কিনতে পারে। তবে বিয়েবাড়ির তালেগোলে টাকাটা 'গোলমাল' হয়ে যেতে কতক্ষণ। তাই বোধহয় এখন 'গিফট-চেক' চালু। এতে দাতা আর গ্রহীতা দুপক্ষেরই লাভ। আসল তো পাবেই, কপালে থাকলে প্রাইজও। এরকম উপহারে অপর পক্ষদেরও নাক গলাবার উপায় নেই। অনেকের মতে, উপহারের এই হচ্চে উৎকৃষ্ট উপায়!

তাছাড়া উপহার দেওয়ার ব্যাপারে আছে রীতিমতই রেষারেষি! ভালো উপহার, মানে দামী উপহার না দিলে ভালো বা দামী হওয়া যায় না। সেটা ভাববার কথা বৈকি! শুনেচি, বহু আগে নতুন বৌয়ের মুখ দেখবার জন্যে রুপোর একটা টাকা দেওয়াই ছিল রীতি। কারোর টাকার গরম থাকলেও ঐ একটি রুপোর টাকা। তার বেশি নয়। তাতে অন্যের অমর্যাদা করা হয়। হায়, সে সোনার খাঁচার দিনগুলোও নেই, আর সে রুপোর টাকাও নেই।

তবে এই গণতন্ত্রের যুগে চালু হয়েচে কো-অপরেটিভ উপহার। চাঁদা করে

চাঁটানো যেমন চালু, তেমনি চালু এখন ঐ চাঁদা-উপহার। অফিসের বন্ধুর বিয়েতে অফিসের কয়েকজন চাঁদা করে একটা দরকারী জিনিস উপহার দিয়ে আসে। হয়তো বন্ধুবর, মানে ভাবীবর কথায়-কথায় বললো, ভাই শশুরমশায় বিয়েতে ড্রেসিংটেবিল দিচ্চেন না (যেন তার প্রাপ্য ফাঁকি দিচ্চেন), তখন বন্ধুরা বললো, ঠিক আছে, আমরা আছি কেন? বৌদি মুখ দেখবে, আর আমরা তাকে বিমুখ করবো? অতএব চাঁদা-উপহার হিসেবে বৌভাতের দিন কুলিরা একটা ড্রেসিং টেবিল নিয়ে হৈ হৈ করে ওপরের ঘরে ওঠালো, বন্ধুরা বুক ফুলিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে দেখলো, আহা, দেখতেও কত ভালো! মনটা ফুলে থাকায় খাবার সময় বেশ কয়েকবার চেয়েও খাওয়া যায়!

বলে রাখি ব্রাদার, উপহারের মাত্রা অনুযায়ী খাওয়ারও রকম-ফের আছে। গল্প নয়, সত্যি ঘটনার কথা বলেছিলো আমার এক ভাইরাভাই। আজমীরে রেলে কাজ করে। বললো, সেখানে এক বিয়েতে নেমতন্ন খেতে গেচি ভালো একটা উপহার নিয়ে। এবং উপহার দিয়ে বাদাম আর সরবত খেয়েই চলে আসছিলাম। এমন সময় পেছন থেকে ডাক পড়লো, বাবুজী মৎ যাইয়ে। আমাকে ডেকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে থালা সাজিয়ে মণ্ডা মেঠাই আর বহু-রকমের নোনতা খাবার খেতে দিলেন। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝিনি, পরে এনকোয়ারী করে জানা গেল, আমার উপহারের মাপ দেখেই হয়েছিলো ঐ খাদ্যের পরিমাপ।

আসলে উপহার দিতে গিয়ে যেন উপহাসের পাত্র না হও। উপহার বা প্রেজেণ্টেসনের মানেই হচ্চে এটেন্সন সহকারে প্রেজেণ্ট কিনে অনুষ্ঠানে অ্যাটেণ্ড করে বলা, প্রেজেণ্ট-স্যার নয়, এই যে প্রেজেণ্ট, স্যার। আর জেনে রাখো, ঐ প্রেজেণ্ট-ই হচ্চে একরকমের ইনভেস্টমেণ্ট! ঐ গানটা শুনেচো তো— তোমার মহাবিশ্ব হতে হারায় নাকো কিছু? এও তেমনি! তুমি তোমার প্রেজেণ্ট দিয়ে ইনভেস্টমেণ্ট করলে, তা নিশ্চয়ই জেনো, হারিয়ে যাবে না। পরে তোমারই বাড়ির কাজেকর্মে ঐ দামেরই উপহার পাবে। তবে বাড়তি সুদ? সরি, প্রেজেণ্টেসনটা ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট নয়। যদিও দু'চার বছর ফেলে রাখতে হয়!

তবে একটা জিনিস ভাববার আছে। যদি দেখো, ভবিষ্যতে তোমার বাড়িতে কোন উৎসব-টুৎসব হবার কারণ নেই, তবে কিন্তু ঐ ইনভেস্টমেণ্ট মাঠে মারা যাবে। অবশ্য সেক্ষেত্রে তুমি তোমার বিবাহ-বার্ষিকী করতে পারো।

তাছাড়া তোমার না হোক, তোমার ও'র জন্মোৎসবও করতে পারো। (অতি-অবশ্য বয়েসটা কমিয়ে), তাতে উনি খুশিই হবেন।

আর তাও যদি না করতে চাও, অথচ ইনভেস্টমেণ্ট করতে হবে, সেক্ষেত্রে কী করতে হবে, আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেচি, বলি তোমাকে। আসলে উপহারটা কী ধরণের হওয়া উচিত ? জিনিসটা দেখতে বড় হবে, ওজনে ভারি হলে তো ভালোই। আর হওয়া চাই একমেব-অদ্বিতীয়ম ! যেক্ষেত্রে দামে ভারি নয়, সেক্ষেত্রে উপহারে নাম লেখবার দরকার কি ? হাতে করে নিয়ে যাচ্চো, যারা দেখবার তারা দেখলেই হলো। এই রকম দুটি উপহারের কথা ভেবে রেখেচি। একটা হচ্চে ফ্লোরেসেণ্ট টিউব। ওজনে বা দামে ভারি নয় বটে, তবে আকারে বেশ বড়, মানে লম্বা। ফুলছাপ রঙীন কাগজে মুড়ে রঙীন ফিতে দিয়ে কায়দা করে বাঁধলে একেবারে অপূর্ব অদ্ভুত ! তাছাড়া একগাদা টেবিল ল্যাম্পের জায়গায় একটা ফ্লোরেসেণ্ট টিউবের মান কত ! আর ওজনে ভারি, আকারে বড়, অথচ দামে কম উপহার হচ্চে—টেলিফোন ডাইরেক্টরী ! ওটিও দিব্যি করে মুড়েসুড়ে, অবশ্য নাম না লিখে, বেশ হাসি হাসি মুখ করে উপহার হিসেবে স্বচ্ছন্দে গছিয়ে দেওয়া যায়। আর টেলিফোন ডাইরেক্টরী কী খারাপ ? বাজে ফাঁপানো উপন্যাসের চাইতে ভালো। কত কী জানা যায় ! লোকে পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন দেখে যে কারণে, ঠিক সেই কারণেই ঐ ডাইরেক্টরীরও উপকারিতা !

তবে এই উপহারের ব্যাপারে আমাকে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলো আমার পাঁচ-বছরের ভাগ্নে তপু। আমার মেয়ে রুণুর জন্মদিনে সে এসে বললো, এই নাও রুণুদিদি, তোমাল জন্মদিনে আমাল উপহাল। বলেই তার হাতে তুলে দিলো পুতুলের ছোট্ট একটা ছেঁড়া ময়লা নরম বালিশ আর একটা চকচকে গোল ছোট পাথর। রুণু ম্লান হেসে বললো, বাঃ চমৎকার তো ? কিন্তু আমি হাঁ হয়ে গেলাম ! সত্যিই অদ্ভুত ! আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। ভেবে দেখলাম, আজকের এই সংসারে ঐ বালিশের মত নরম হয়ে থাকলে তুমি হবে ঐ ছেঁড়া ময়লা বালিশটার মতোই সকলের অবজ্ঞার পাত্র। আর যদি ঐ পাথরটার মতো হতে পারো শক্ত, তবেই হবে তুমি ঐরকম চকচকে ঝকঝকে, মানুষের সমাজে একজন কেউকেটা।

সারগর্ভ ভাষণ

নানা জায়গায় সভা সমিতি করে সারমর্ম যা বুঝেচি তা হলো কোন সারগর্ভ ভাষণ দিতে হলে, মানে, কোন বিষয়ে বেশ ভালো করে বিশ্লেষণ করে যদি কিছু বলতে হয়, তার সব চাইতে উপযুক্ত স্থান হচ্চে কোন ঘরোয়া বৈঠক।

কথায় আছে স্থান কাল পাত্র বুঝে কথা বলতে হয়।

সারগর্ভ ভাষণ দেবার উপযুক্ত স্থান যেমন কোন ঘরোয়া বৈঠক, তেমনি কাল হচ্চে নিরিবিলি সন্ধ্যা এবং শোনবার পাত্র যাঁরা আসেন তাঁরা বেশির ভাগই ভাষণটির বিষয়ে আগ্রহী। ঐ সব ঘরোয়া সাহিত্যের বৈঠকে সাহিত্যিকরা বা সাহিত্য-রসিকরা আসেন, অন্যান্য শিল্পের বৈঠকে তেমনি আসেন ঐ ধরণের শিল্পী বা শিল্প-রসিকরা।

ঐসব ঘরোয়া বৈঠকে বলেও আনন্দ, শুনেও আনন্দ।

আর সারগর্ভ ভাষণও মাঠে মারা যায়, অনেকটা বেনাবনে মুক্তো ছড়ানোর মতো হয়—মঞ্চ-সভায়। অর্থাৎ কোনো নাটক মঞ্চস্থ হবার আগে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। নাটক করবে করো, তার আগে উদ্বোধক, সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি ইত্যাদি হরেক রকমের অতিথি আনিয়ে তাঁদের দিয়ে ভাষণ দেওয়াবার কি দরকার? অনেক তো অতিথি এসেচেন নাটক দেখতে, তাঁরা ঐদিন বক্তৃতা শুনতে আসেননি। কিন্তু এখন এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েচে।

এইরকম একটি মঞ্চ-সভার বিবরণ দিই—

'সাজাহান' নাটক অভিনয় হবে। যারা সাজাহান বা ঔরংজেব সাজচে, (ক্লাবের দাদা'রাই সাজে) তারা তো জরি দেওয়া ভেলভেটের পোষাক পরে রাস্তায় বেরুতে পারে না। কাজেই নাটুকে দলের কয়েকজন থাকে বাইরের ঝামেলা

মেটাতে। তাতেই তাদের আনন্দ। একটু-আধটু সর্দারী করাও চলে। বিশেষ করে দর্শকদের সীটে বসাবার সময়। সুন্দরী তরুণী দেখলে উৎসাহটা বেড়ে যায় আরো।

এমনি দু'তিনজন ছোটে দু'তিন দিকে উদ্বোধক, সভাপতি, প্রধান অতিথিদের ধরে আনতে—নাটুকে কোনো দাদার গাড়ি, বা পাড়ার গাড়ি বা ট্যাক্সি নিয়ে। কেউ ছোটে খাবারের দোকানে ঐ তিনজনের জন্যে দু'টো করে সিঙ্গাড়া, আর দুটো করে সন্দেশ মোট ছ'টা সিঙ্গাড়া আর ছ'টা সন্দেশ কিনতে। জানা আছে, ও'রা আর দুটো সিঙ্গাড়া বা সন্দেশ চাইবেন না। আর একজন ছোটে বাজারে ফুলের দোকানে তিনটে মালা কিনতে।

জুঁই ফুলের মালার দাম খুব বেশি, সিঙ্গল রজনীগন্ধার মালাগুলো বড্ড সরু। ঘোড়ার মালা, মানে তার দিয়ে গাঁথা মালাগুলোয় অতিথিদের ঘাড় ছ'ড়ে যেতে পারে। গাঁদা ফুলের মালা হলেই চলতো. তবে দোকানদার বললো, ওসব মালা, বাবু, বলির পাঁঠার গলায় দেওয়া হয়, এখনও সভাপতি প্রধান অতিথিদের জন্যে চালু হয়নি। পরে হয়তো হবে। অগত্যা দর কষাকষি করে একটা বেলফুলের বা ডবল রজনীগন্ধার মালাই কিনতে হয়। উপায় নেই। এদিকে একটু সাশ্রয় না করলে ওদিকে নাটকের খরচ-খরচা করে পরে লুচি মাংস ও গুডব্যাডের জন্যে কিছু রেস্ত বাঁচানো তো দরকার।

এইরকম একটা অঙ্ক-সভায় বা নাটকের উদ্বোধনী সভায় যেতে হয়েছিলো মানের দায়ে, প্রাণের দায়ে, এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মুখ রাখবার দায়ে। সে 'বড়মুখ' করে চিঠি দিয়েচে আমি যেন তার পাড়ার ছেলেদের নাটক-সভায় অতি অবশ্যই যাই।

গেলাম। গিয়ে দেখি, রীতিমতই হট্টগোল। চারদিকে চ্যাঁ-ভ্যাঁ। যেন মেছো-বাজার। দর্শকরা সবাই ব্যস্ত সীটের খোঁজে। ভুল সীটে বসায় তর্ক আর গলাবাজি।

এই হট্টগোলের মাঝে পর্দা উঠলো। আমাদের মালা পরানো হলো। অর্থাৎ বরণ করা হলো। মালা পরানো মাত্রই খুলে ফেললাম, যেন গলায় সাপ জড়ানো হয়েচে। ঐটাই নিয়ম। ভাবটা, এসব মানের অনেক উর্ধ্বে আমি। পরে হাতে প্রোগ্রাম গুঁজে দেওয়া হলো। আমরা হাসি-হাসি মুখ করে বসে রইলাম।

প্রথমে উদ্বোধনী সঙ্গীত হলো। টেবিলে হারমোনিয়ম রেখে দু'তিনজন

তরুণী ও একটি তরুণ গান গাইলো—এই লভিনু সঙ্গ তব···। কিন্তু কে শোনে সে গান। তখনও হল গমগম করচে নানারকম মিশ্র আওয়াজে।

পরে উদ্বোধক উঠলেন। ভাষণ দেবার পর তিনি বসতেই দেখি হাততালি। অর্থাৎ মাইকের সামনে যখন দাঁড়িয়েচেন, তাঁর ঠোঁট দুটো নড়েচে যখন, তখন নিশ্চয়ই বলেচেন কিছু। অতএব হাততালি।

তার পরে সম্পাদকের বিবৃতি। তিনি একখানা কাগজ পড়তে লাগলেন। হয়তো তাঁদের ক্লাবের বিবিধ কর্মকাণ্ডের বিবরণ। থামলেই আবার হাততালি। নাই বা শোনা গেল। কাগজের দিকে চেয়ে চুপ করে ছিল না নিশ্চয়ই।

তারপর প্রধান অতিথির ভাষণ। এবং ঐ একই অবস্থা!

বুঝলাম, আমার সভাপতির ভাষণও কোন আসন পাবে না এ সভায়। মেজাজটা বিগড়ে গেছলো সব কাণ্ডবাণ্ড দেখে। আমি ওঠবার সঙ্গেসঙ্গেই একজন এসে আমার কানেকানে বলে গেল, একটু টেনে বলবেন স্যার। মানে এখনও সকলের ড্রেস শেষ হয়নি কিনা—!

ও, তা হলে একটা সারগর্ভ ভাষণই দিতে হবে। বেশ লম্বা চওড়া। গলা খাকরি দিয়ে আরম্ভ করলাম—

উপস্থিত আমার ভায়েরা বোনেরা, আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে খুবই আনন্দিত হয়েচি। আজকের এই আনন্দ-অনুষ্ঠানে আমরা হচ্চি মঙ্গল-অনুষ্ঠানে প্রবেশ-পথের কলাগাছ আর মাটির কলসী!

লক্ষ্য করে দেখলাম, কেউই আমার কথা শুনচে না। সকলেই সীটের খোঁজে আর সীটে বসতে ব্যস্ত। আর সেকারণে চারদিকে হৈ হল্লা, গোলমাল। দেখে মেজাজটা আরো বিগড়ে গেল। বললাম—

আমাদের যে কেন এই ধরণের সব অনুষ্ঠানে ডেকে আনা হয় জানিনে। আর আমরাও তেমনি হয়েচি। একবার তু বলে ডাকলেই ছুটে আসি। আমাদের সাহিত্যিকদের চাইতে গাইয়ে বাজিয়েদের তবু দাম আছে। তাদের ডাকতে হলে সাধাসাধি করতে হয়, বেশ কিছু দক্ষিণে দিতে হয়, গাড়িতে করে নিয়ে আসতে, দিয়ে আসতে হয়।

আর আমাদের বেলায় দুটো করে সিঙ্গাড়া সন্দেশ খাইয়ে আর গলায় মালা ঝুলিয়ে দিলেই হলো। আনবার সময় যদিবা গাড়িতে করে আনলো, যাবার সময় 'আচ্ছা আসুন' বলে বিদেয়! অবশ্য সব ক্ষেত্রে নয়।

এমন সময় কর্মকর্তাদের একজন আমার কানেকানে বলে গেল, একটু টেনে

চালিয়ে যান। এখনও নাটকের সকলের ড্রেস করা শেষ হয়নি।

শুনেই এবার মাথায় রক্ত যেন চড়াৎ করে উঠলো। বললাম, কর্মকর্তা আমাকে টেনে চালাতে বললেন। কিন্তু কত টানবো? এ কি রবার! বেশ, প্রাণপণে টানাই যাক। হ্যাঁ প্রথমে আবৃত্তি হোক, হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়, একটি কোথায় হারিয়ে গেল, রইলো বাকি নয়।···তারপর? তারপর? 'অ-এ অজগর আসচে তেড়ে, আমটি আমি খাবো পেড়ে।' হ্যাঁ, তারপর আগডুম বাগডুম ঘোড়ার ডুম বাজে। তারপর কি মনে আসচে না ছাই—। যাক গে, এবার গান হোক! (ভাঙ্গা গলায় গানের প্রথম লাইন) ললিতা, ওকে আজ চলে যেতে বল্ না? হ্যাঁ, দম মারো, দম্! হ্যাঁ মনে পড়েচে, মাগো, আমার এই ভাবনা, আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কোথায় যাবো নেই ঠিকানা।' তাই বটে! এখানে তো এলাম, এবার কোথায় যাবো কে জানে! হ্যাঁ, এবার একটু প্রাণ খুলে গালাগালি দিই—ড্যাম, ব্লাডি, সোয়াইন্। আরো জোরদার হিন্দী গালাগালি দেবো? যাকগে, থাকগে।

বসে পড়লাম। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতা(?)দের হাততালি। এতক্ষণ যখন দাঁড়িয়ে ঠোঁট নাড়ালাম, তখন নিশ্চয়ই একটা সারগর্ভ ভাষণই দিয়েচি!

কিন্তু আমার দুপাশে উদ্বোধক আর প্রধান অতিথি আমার ভাষণ শুনতে পাচ্ছিলেন, আর নিশ্চয়ই এতক্ষণ আঁতকে আঁতকে উঠছিলেন। আমি বসতেই উদ্বোধক মশায় গলা বাড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ মশায়, এতক্ষণ কি আবোল তাবোল বললেন? আমি তো ভয়ে মরছিলাম।

আর একদিক থেকে প্রধান অতিথি গলা বাড়ালেন, হ্যাঁ মশায়, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

আমি হেসে বললাম, আমার মস্তিষ্ক অত্যন্ত সুস্থ। এই রকম সভাতেই তো প্রাণ খুলে সব বলা যায়। এমনটা বাড়িতেও বলা যায় না। বরং বলতে গেলে পাগল হয়ে গেছি ভেবে, পাগলাগারদে ঢুকিয়ে দেবে।··· তারপর মাথা নেড়ে বললাম, কাল দেখবেন, খবরের কাগজে কি রিপোর্ট বেরোয়।

পরদিন খবরের কাগজে সত্যিই রিপোর্ট বেরুলো। অমুক সংস্থার অমুক বাৎসরিক সভায় সভাপতি শ্রী অমুক তাঁর সারগর্ভ ভাষণে বলেচেন, আজ দেশের তরুণদের জেগে ওঠবার দিন আগত। দেশের উন্নতির ভার তাঁদের উপরই। তাঁরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তিনি যৌবনের জয় গান করেন।

কর্তৃপক্ষরাই রিপোর্ট লিখে পাঠিয়েছিলো খবরের কাগজে।

গুজবে কান দেবেন

মনে আছে, আমাদের স্কুলে, দমদমে 'বয়েজ ওন হোম'-এ মাঝে মাঝে একটা মজার খেলা হতো। ছুটির সময় বা বর্ষাকালে বাইরে বৃষ্টি হলে, আমাদের বড় মাস্টারমশায়, জীবেনদা স্কুলের বড় হলটার মেজেতে ছেলেদের পাশাপাশি বসিয়ে দিতেন। আর সারি-র প্রথম ছেলেটাকে বলে দিতেন, তার পাশের ছেলেটার কানে-কানে কোন একটা কথা বলে দিতে। সে আবার ঐ কথাটা তার পাশের ছেলের কানে বলবে। সে তার পাশের ছেলের কানে। এমনি করে পাশাপাশি-বসা পঁচিশ-তিরিশটা ছেলের কানে-কানে চলবে কথাটা এবং শেষে যাচাই করে দেখা হবে প্রথম ছেলেটা তার পাশে-বসা দ্বিতীয় ছেলেটার কানে কানে যে কথাটা বলেছিলো, সেটা ঠিকমত শেষ-ছেলেটার কানে পেঁছেচে কিনা।

না। ঠিকমত সেই কথাটা শেষ ছেলেটার কানে পেঁছুতো না। শেষপর্যন্ত কোন একটা অন্য কথা শুনতে পেতো শেষ-ছেলেটা। আর সে যখন সেটা বলতো, তখন সবাই আমরা হাততালি দিয়ে উঠতাম, হলো না, হলো না।

ধরা যাক, প্রথম ছেলেটা তার পাশে-বসা দ্বিতীয় ছেলেটার কানেকানে বললো, 'তিল'। এই সামান্য 'তিল' এক-একজনের কানে—তেল, তেলা, তলা, তালু, তেলো, তুলো, তুলি, তিলি, তেলি, তালা, তেলা ইত্যাদি হতে-হতে দেখা গেলো, শেষ-ছেলেটার কানে গিয়ে সেটা 'তাল' হয়ে দাঁড়িয়েচে। তিল এমনি করেই তাল হয়ে যায়।

তখন ছোটবেলায় এই মজার খেলাটার মানেটা ঠিক বুঝতে পারিনি। ভাবতাম, খেলাটা খেলাই। এখন এই খেলার মানে হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারি। এর নাম দেওয়া যেতে পারে—'গুজব খেলা।'

এই 'গুজব' শব্দটা বাংলা ভাষার একটা অতি আশ্চর্যজনক অবদান।

রীতিমত ধাঁধা লাগানো শব্দ। শব্দটা নিয়ে একটা ধাঁধা তৈরী করা যেতে পারে—

তিন অক্ষরে নাম তার, সর্বলোকে জানে,
প্রথম দুই অক্ষরে কথা, হয় কানে-কানে ॥
এক আর তিন অক্ষরে হয় 'গুবলেট',
দুই-এ তিন-এ 'কাজ' না পেলে, মাথা হয় হেঁট ॥

'গুজব'-এর প্রথম দুই অক্ষরেই তো শুরু হয় চুপি চুপি গুজগুজ আর ফুসফুস। প্রথম আর তিন অক্ষরে গুব করে সব গুবলেট। এই গুজব থেকেই অনেককিছু হয়ে যায় গুবলেট। আর শেষের দুই অক্ষরে 'জব' ইংরাজীতে যাকে বলে 'কাজ'—কাজ না পেলে মানুষের কি দাম থাকে? অবশ্য গুজব ছড়ানোর কাজ হয় তখন নিন্দুকের।

তেমনি ইংরেজী ভাষায় 'রিউমার' কথাটাও মানুষের জীবনে আসে উৎকট হিউমার হয়ে। রিউমার হা-রে-রে-রে করে এমন মার দিয়ে যায় যে সামলানো দায় হয়ে ওঠে।

অনেকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, গুজব ছড়াবেন না। এ ধরণের বিধি-নিষেধ করা মানে মানুষের মনের উপর অত্যাচার করা। চাষী যেমন মাঠে ধানে বীজ ছড়ায়, পরে পেটের খাদ্যের যোগাড় হয়, তেমনি হাওয়ায় গুজব ছড়িয়ে না দিলে মনের খাদ্য মিলবে কি করে? অথচ দ্যাখো, মাঠে ধান বোনবার জন্যে জমি চাই, তাতে জল দেওয়া দরকার। কিন্তু এই মনের খাদ্যের জন্যে অবারিত আকাশ বাতাস রয়েচে, আর তারপর কোন কিছুই করতে হয় না। দিব্যি ফলন ফলতে থাকে।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ির উঠোনে যেমন গোবর ছড়া দিয়ে পবিত্র করা হয়, ঠিক তেমনি গুজব ছড়ালে মনের উৎসাহ বাড়ে, মন উৎফুল্ল হয়।

এ সংসারে গুজব না থাকলে মানুষ কী নিয়ে থাকবে? বাঁচবে কী করে? মানুষ জব-লেস বা বেকার হয়ে পড়বে, মানুষের মনে মর্চে পড়ে যাবে! আর মানুষের পক্ষে একটু গুজগুজ ফুসফুস না করলে চলে কখনো? পুজো-প্যাণ্ডেলে বা জলসায় লাউডস্পীকার মানায়, কিন্তু ক্লাবে বা কোন রকাড্ডায়? সেখানে গুজগুজ ফুসফুসই চালু। তাছাড়া এই গুজব থেকে যদি কিছু গুবলেট হয়ই, হোক না। গুবলেট না হয়ে যদি সব কাজই ঠিকঠিক হয়ে যায়, তবে কার্যোদ্ধারটা হবে কী করে? লোকে কাকে তবে 'কর্মবীর' বলে হাততালি বা বাহবা দেবে?

আরো বলি, গুজব আছে বলেই তো 'সত্যে'-র মান ! যেমন রাত আছে বলে দিনের মান। পাপ আছে বলেই পুণ্য। পুণ্য নইলে মানুষের মনে শূন্য হয়ে যেতো।

তাছাড়া গুজবের চাইতে ঐ সত্য-টাই বরং বেশিরকম গুবলেট করে সব কিছুতেই। দ্যাখো না, সেযুগে রামচন্দ্র পিতৃ-সত্য পালন করবার জন্যে বনে গেলেন। বলি, বনে গিয়ে হলোটা কী? বৌটাকে রাবণরাজা হরে নিয়ে গেলো। সেজন্যে যত রাজ্যের বাঁদর হনুমান জোগাড় করে নিয়ে সাগর ডিঙিয়ে লড়াই করতে হলো। যত সব ঝুটঝামেলা। কোথায় দিব্যি রাজা হয়ে বসে রাজভোগ খাবে, তা নয়, সত্য-পালনের জন্যে গাছের বল্কল পরা আর ফলমূল খাওয়া ! হুঃ ! যত্তোসব !

পরে অবশ্য অযোধ্যার প্রজারা গুজব রটালো যে রাবণরাজার প্রাসাদে থাকায় সীতার চরিত্র ভালো নয়। তাই তো শেষপর্যন্ত সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হলো। তাতে ক্ষতিটা কী হলো? আগুনের মধ্যে থেকে সীতা পাকা-সোনা হয়ে বেরিয়ে এলেন। সকলকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি কত বড় সতী ! ভালোই তো হলো।···

তুমি হয়তো বলবে, রাম পিতৃ-সত্য পালন করেছিলেন বলেই তো অমন রামায়ণ লেখা হলো। হুঃ, স্বীকার করি। কিন্তু ঐ পিতৃ-সত্য পালন না করলেও রামায়ণ লেখা হতো, অন্যরকম লেখা হতো। হয়তো আরও ভালো লেখা হতো। তাছাড়া আজকালকার চালু রামায়ণটা-ই যে ঠিকমতো লেখা, তা নিয়েও তো ভারি-ভারি পণ্ডিতরা সন্দেহ প্রকাশ করচেন।

যাকগে। রামায়ণ-যুগের সত্য-পালনের কথা ছেড়ে দাও। আজকালকার কামায়ণ-যুগে (এ কাম সে কাম নয়। এখানে কাম মানে কামনা, লোভ, স্বার্থপরতা।)—হ্যাঁ, এই কামায়ণ-যুগে মহাত্মা গান্ধী সত্য-পালন করতেন। কিন্তু শেষটায় কী হলো? এক আততায়ীর হাতে প্রাণটা দিতে হলো। কাজেই ঐ 'সত্য'টাও কম শয়তানি করে না, কম গুবলেট করে না।

সেদিন একটা নাটকের বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। নাটকটার নাম 'সত্য মারা গেছে।' সত্য যদি সত্যিই মারা গিয়ে থাকে, তো বাঁচা গেচে। তাতে গুজবের মান বাড়বে !

অনেকেই গুজবকে খারাপ বলে, আমি বলিনে। ধরো, গুজব রটে গেলো শত্রুপক্ষ অনেক অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করেচে, সৈন্যসামন্ত বাড়াচ্চে। অমনি

আমরা কী করবো ? আমরাও সেইমত তৈরী হতে থাকবো। আর যদি গুজব না রটতো, তবে ? আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতুম। আর আমাদের অস্ত্রশালায় গোলা-গুলি না তৈরী করে চুষিকাঠি বা হ্যারিকেন লণ্ঠন তৈরী করতাম। আর তার পরিণাম কী হতো ? ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

তারপর ধরো, আমার নামেই একটা গুজব রটে গেলো, যে লোকটা একদম লিখতে পারে না, অথচ অহংকারে মটমট করচে। গুজবটা কানে এলেই সঙ্গেসঙ্গে আমি কী করবো ? আরো মন দিয়ে ভালো করে লেখবার চেষ্টা করবো। আর কেউ বাড়িতে দেখা করতে এলে হেসে হেসে তার সঙ্গে কথা বলবো, ইলেকট্রিকের ইউনিটের দাম বেড়ে গেলেও বন্ধ ৪৮ ইঞ্চি পাখাটা খুলে দেবো, চার আনা দামের সন্দেশের সাইজটা বড্ড ছোট হয়ে গেচে বলে আট আনার, কিংবা পকেটে পয়সা থাকলে একটাকা দামের অন্তত দুটো সন্দেশ কিনে দেবো। নইলে দিতাম, না, ভালো করে লেখবার চেষ্টা করতাম !

আরো ধরো, গুজব রটে গেলো, পাড়ার ঐ পলকা নামের মেয়েটা (না, না, এসব ব্যাপারে আমি নেই) পাড়ারই গনশার সঙ্গে প্রেম করচে। চিঠি চালাচালি হচ্চে। সময় ঠিক করে বাইরে মীট করে সিনেমা দেখচে, রেষ্টুরেণ্টে খাচ্চে। আর এমন কি এ-ও রটলো যে ··যাকগে, রেখে ঢেকে বলি — হয়তো পলকাকে শীগ্রী কোন নার্সিংহোমে যেতে হবে। এক্ষেত্রে কী হবে ? পলকা চাইছিলো গনশাদার সঙ্গে তার বিয়েটা হোক, গনশা-ও তাই-ই চাইছিলো। পলকা হালকা, কাজেই তার ভার সে নিতে পারবে। কিন্তু পলকার বাবা-মা আর গনশা-র বাবা-মা'র মত ছিলো না মোটেই। কিন্তু ওদের প্রেম-গুজব (হয়তো সত্যিই গুজব) রটে গেলো যখন, তখন ঐ দুজনের বাবা-মা'রাই এগিয়ে এসে শলাপরামর্শ করে দুজনের চারহাত এক করে দিলেন। এমনই গুজবের জোর !

কেন, আমার বন্ধু নস্তে, তার প্রেমিকা মেন্তিকে কী করে বিয়ে করলো ? স্রেফ গুজব রটিয়ে দিয়ে। নিজেই গুজব রটিয়ে দিলো এমনভাবে যাতে মেন্তির বাবা-মায়ের কানে কথাটা ওঠে। ওমনি তাঁরা পড়িমরি করে ছুটে এসে নস্তের মা-বাবাকে ধরে মালা-বদলটা করিয়ে দিলেন। আমি সে বিয়ের নেমন্তন্নে খেয়ে এসেচি। এই গেস্ট-কনট্রোলের দিনেও খুব ভালো খাইয়েছিলেন ও'রা। বোধকরি গুজবটাকে মিঠে করার জন্যে বা চাপা দেবার জন্যে।

সেদিন গুজবের এক কারখানা দেখে এলাম। বেশ বড় কারখানা।

সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ এই গুজবের কারখানার সন্ধান পেয়েচেন কিনা জানিনে। তবে কোথায় সে কারখানাটা পরে বলচি।

এক বিশেষ উপায়ে সেই গুজবের কারখানায় পরিচয়পত্র নিয়ে পেঁছুতেই কারখানার ম্যানেজার আমাকে খাতির করে তাঁর অফিসঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন, চা খাওয়ালেন। ম্যানেজারের চেহারাটা বিরাট। বললেন, আমাদের এই গুজবের কারখানার বিষয়ে কী কী জানতে চান বলুন।

আমি অফিসঘর থেকেই কান পেতে শুনলাম কারখানার ভেতর থেকে গুঞ্জন ধ্বনি ভেসে আসচে। মনে হলো, দূর থেকে মেছোহাটার শব্দ যেন আসচে কানে। আমি ম্যানেজারকে প্রথমেই প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, আপনাদের এই কারখানার নামটা কি?

বললেন, গুজব ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী প্রাইভেট আনলিমিটেড।

—লিমিটেড কোম্পানীই তো শুনেচি। এটা আনলিমিটেড কেন?—জিগ্যেস করতেই হেসে বললেন, মশায়, গুজবের কোন সীমা আছে? লিমিট আছে? নেই। তাই আনলিমিটেড। আরো বললেন, প্রাইভেট কোম্পানী কেন, তা তো বুঝতেই পারচেন নিশ্চয়ই। গুজব প্রাইভেট বা গোপনেই তৈরী হয়, পরে প্রকাশ হয় প্রকাশ্যে। মানুষের বিশ্বাস যা রটে তা কিছুটা বটে। মানুষের ঐ বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই আমাদের কারবার।

বলেই বললেন ম্যানেজার, আমিই বরং আমাদের এই গুজব ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর পরিচয়টা প্রথমে দিই। পরে আপনার যদি কোন জিগ্যাস্য থাকে তো জিগ্যেস করবেন।

বললাম, সেই ভালো।

ম্যানেজার বলতে লাগলেন, আমাদের এই কারবার অনেক দিনের। কতদিনের তা আমি নিজেই জানিনে। বোধ হয়, মানুষ যখন থেকে কথা বলতে শিখেচে, সেদিন থেকেই। এই গুজবের কারখানায় কখনো শ্রমিক-আন্দোলন হয় না। ইউনিয়ন আছে অথচ কোন দাবীদাওয়া নেই। সবাই উৎসাহী শ্রমিক। কেউ টাকাটা বড় করে দেখে না, মনের আনন্দটাই বড় করে দেখে। বরং শুনে আশ্চর্য হবেন, এখানকার শ্রমিকরা তাঁদের শ্রমের জন্যে কোন টাকাই আশা করেন না। কারণ তাঁরা অন্যত্র চাকরী করে টাকা উপায় করেন আর অবসর সময়ে এই কারখানায় এসে তাঁরা শ্রমদান করেন। আর আশ্চর্য, এই শ্রমদানের ব্যাপারে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই ঢের বেশি আগ্রহী। আর এইসব

শ্রমিকরা প্রত্যেকেই এই কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার্স। কাজেই বুঝতেই পারচেন, আলাদা-আলাদা শিফটে এখানে চব্বিশ ঘন্টাই কাজ হয়।

বললাম, খুব আশ্চর্য তো?

ম্যানেজার হাসলেন, এর মধ্যেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্চেন? শুনুন আগে সব। দিনে এই চব্বিশ ঘণ্টাতেও আনলিমিটেড বা সীমাহীন গুজব তৈরী শেষ করা যায় না। আটচল্লিশ ঘণ্টা দিনরাতেও হওয়া মুশকিল। একশো ঘণ্টায় দিনরাত হলে হয়তো কিছুটা হতো। তাই এই গুজব কোম্পানীর ব্রাঞ্চ অফিস খুলতে হয়েচে অনেক জায়গায়।

যথা?

দুপুরে মেয়েদের বৈঠকে। টিফিনের ফাঁকে কাজের ফাঁকে অফিসে। বিকেলে রকাড্ডায়। রাত্রে তাসের আড্ডায়। এখান থেকে যে গুজবটা আমাদের শ্রমিক বা সভ্য-সভ্যার কানে তুলে দেওয়া হয়, তারা সেটাকে ঠিকঠিক জায়গায় প্রচার করে। তাছাড়া আমাদের অনেক-অনেক ডিস্ট্রিবিউটার আছে। যেমন – বাড়ির ঝি চাকর ঠাকুর, মেথর মেথরানী, ধোপা ধোপানী, নাপিত নাপতিনী, পাড়ার মস্তান, পার্কের বুড়োর দল, বাড়িতে পানজর্দা মুখে গিন্নীরা, স্কুল কলেজে মেয়েরা ছেলেরাও। রাজনৈতিক দল বা সমাজসেবীদের দলেও আমাদের অনেক ডিস্ট্রিবউটর আছে।

কৌতুহলী হয়ে জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, আপনারা ঐসব গুজব কীভাবে তৈরী করেন?

কীভাবে? – ম্যানেজার মৃদু হাসলেন, এজন্যে আমাদের রিসার্চ ল্যাবরেটরী আছে। সেখানে হরদম নানারকম গুজব নিয়ে রিসার্চ করা হচ্চে। কখনো একেবারে পিওর গুজব তৈরী হচ্চে, আবার কখনো বা সত্যের সঙ্গে নানা পার্সেণ্টেজে ভেজাল মিশিয়ে গুজব তৈরী হচ্চে। তাছাড়া নানা-রকমের গুজব আছে। যেমন---অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, সিনেমাটিক, থিয়েটারিক, যাত্রা-বিষয়ক, শিক্ষা-বিষয়ক, স্বাস্থ্য বিষয়ক, খেলা-বিষয়ক, দলগত, ব্যক্তিগত, পেশাগত,—কত বলবো! এসব রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে তৈরী হলে স্যাম্পেলগুলোকে ভালো করে ইন্সপেকসন করা হয়, টেস্ট করা হয়, তারপর সেগুলিকে কোল্ড স্টোরেজে সযত্নে ভাগ-ভাগ করে স্টক করে রাখা হয়। পরে সময়মত সেগুলিকে বাজারে ছাড়া হয়। কোন্ সময়ে কোন্ গুজবটা বাজারে চালু করতে হবে বা পাচার ও প্রচার

করতে হবে, সেজন্যেও আমাদের সব এক্সপার্টরা আছেন। তাঁদের কমিটি থেকে পাশ হলে তবেই সে গুজবটা ছড়াবার জন্যে ছাড়পত্র পায়। এই যেমন ভোটের সময় একরকম গুজব ছড়াতে হবে, হরতালের সময় আর এক রকম, পরীক্ষার সময় অন্যরকম, দাঙ্গার সময় বিশেষ রকম, যুদ্ধের সময় তাল বুঝে ইত্যাদি।

জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, কোন্ রকম গুজব বেশি চলে? মানে পপুলার?

কেলেংকারীর গুজব। বিশেষ করে কোন নামকরা ভদ্রঘরের কেলেংকারীর গুজব যদি ছড়ানো যায় তো সঙ্গেসঙ্গে বাজার মাৎ। যাকে বলে বক্স অফিস হীট! —ম্যানেজার সোৎসাহে হাত-পা নেড়ে বললেন, ঐ ধরণের গুজবের কাছে আর সব গুজব স্রেফ ছেলেমানুষ! জোলো নীরস খবরের কাগজগুলোও তখন সুস্বাদু হয়ে ওঠে। হু হু করে কাগজের প্রচার বেড়ে যায়। জানেন, অনেকে নিজেদের স্বার্থে আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের গুজব কিনে থাকেন। গুজব আমরা বাইরে বিদেশে এক্সপোর্টও করি। তাতে মোটা টাকা পাওয়া যায়।

বললাম, তা তো হবেই। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই।

বলুন।

আচ্ছা, আপনারা গুজবটা প্রথমে চালু করেন কী করে?

ম্যানেজার হেসে বললেন, এ অতি সোজা ব্যাপার। মানে, গুরু যেমন শিষ্যকে মন্ত্র দেন কানেকানে, আমরাও তেমনি এখানে আমাদের সভ্য-সভ্যাদের কানেকানে গুজবটা গুজে দিই। তারপর ঐ যে বললাম, আমাদের নানা ব্রাঞ্চ আর ডিস্ট্রিবিউটারদের মুখে মুখে সেটা ছড়িয়ে পড়ে, সামান্য বীজ থেকে যেমন দেখা দেয় বিরাট বটবৃক্ষ। তবে সব সময়েই গুজবটা গুজগুজ ফুসফুস করেই চলতে থাকে। কোন মাইকের দরকার হয় না। আর একটা সুবিধে হচ্ছে এই যে, তাতে ফুসফুসে লাংসে জোর পড়ে না। বরং ফুসফুসের ফোঁস-ফোঁসানিতে লাংস আরো ভালো হয়। অবশ্য হার্ট বা ফুসফুস যাদের আগে থেকেই খারাপ, তাদের পক্ষে তেমন-তেমন গুজব খুবই মারাত্মক সন্দেহ নেই।

এবার সাহস করে বললাম, তাহলে মশায়, গুজব প্রচার করা তো অন্যায়।

অন্যায় কেন ? ম্যানেজার সোজা হয়ে বসলেন, যারা গুজবকে সত্যি বলে মনে করে না, এমন যদি কারোর মনের জোর থাকে, মানে যারা গুজবকে স্রেফ গুজব বলেই মনে করে, তারা গুজবে কান না দিলেই পারে। বলি, মদ খেলে যে মানুষ বেহুঁস হয়, নানারকম অপকর্ম করে, সেজন্যে কি মদের দোষ, না মদ বেচনেওয়ালা শুঁড়ির দোষ ? এই যে বন্দুক তৈরী হচ্চে, গুলি তৈরী হচ্চে, কী জন্যে ? শিকার করবার জন্যে বা যুদ্ধে মানুষ মারবার জন্যে। কিন্তু তা বলে কী বন্দুক বা গুলি তৈরী বন্ধ হচ্চে ?

ম্যানেজার হঠাৎ ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, আপনি তো মশায় লোক সুবিধের নন। আপনি আমাদের বিশেষ বন্ধুর পরিচয়-পত্র এনেছিলেন, তাই আপনাকে বিশ্বাস করে সব কিছু বলে ফেললাম। আপনি গুপ্তচর-টর নাকি ?

বলেই ম্যানেজার একটা চড় তুললেন। বললেন, দেখুন মশায়, আপনি যদি গুপ্তচর হন, তবে এই একচড়েই আপনার মুন্ডু ঘুরিয়ে দেবো। যা শুনলেন, সব গুলিয়ে যাবে। এই গুজবের কারখানাকে গুজব বলেই মনে হবে, বুঝলেন ?

ভয় পেয়ে আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো, ক্রিং ক্রিং !

ক্রিং ক্রিং

আমার কানের কাছে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠতেই আমার ঘুমটা গেলো ভেঙে। দেখি, গা ঘেমে গেছে ভয়ে আর আতংকে। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা কানে তুলে কাঁপা গলায় বললাম, হ্যালো।

আমার ফোনের নম্বর জিগ্যেস করায় বলতেই অপর দিক থেকে বললো, সরি, রং নাম্বার।

রিসিভারটা রেখে মনেমনেই বললাম, না, না, রাইট নাম্বার। ভাগ্যিস রাইট-টাইমে ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন, তাই ঐ বিরাট জোয়ান ম্যানেজারের মুন্ডু ঘোরানো বিরাশি সিক্কার চড় থেকে গালটাকে বাঁচানো গেলো।

জানিনে কারা গুজব রটায়। টেলিফোন নাকি বাজে হয়ে গেছে। অসময়ে বাজে, সময়মত বাজে না। না, না, বাজে নয়।